# সূচি পত্র

সুব্রত সেন

স্নেহাস্পদেষু—



# বাত্রেশের ধাঁধা

সমীর সরকার

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজটা ভাঁজ করে রেখে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্তবাবু তো সাংবাদিক। তাই কথাটা আপনারে জিগাই।

বললুম,—বলুন হালদারমশাই।

গোয়েন্দাপ্রবর একটু হেসে বললেন,—আপনাগো কাগজে বিজ্ঞাপনে দেখি, কোনোটার হেডিং নিরুদ্দেশ। আবার কোনোটার হেডিং নিখোঁজ। ক্যান? মানে তো এক।

—এটা বিজ্ঞাপন বিভাগের লোকেদের খেয়াল। তাঁরাই তো বিজ্ঞাপনের হেডিং দেন।

—কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিলেন। দাঁতে কামড়ানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তাঁর টাকের ওপর ঘুরপাক খেতে-খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি পত্রিকাটা বুজিয়ে রেখে বললেন,—জয়ন্তের জবাব হালদারমশাইয়ের মনঃপূত না হওয়ারই কথা।

হালদারমশাই সায় দিলেন,—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ। দুইরকম হেডিং অথচ একই মানে। ক্যান দুইরকম?

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। মিটিমিটি হেসে বললেন,—হালদারমশাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন জয়ন্ত! এটা হালকাভাবে নিয়ো না। রীতিমতো ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্বের মধ্যে ব্যাপারটা পড়ে।

বললুম,—সর্বনাশ! এই সুন্দর সকালবেলায় ওইসব গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আওড়াবেন না প্লিজ!

—মোটেও গুরুগম্ভীর তত্ত্ব নয় জয়ন্ত! হালদারমশাই তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। তুমিও একবার পড়ে নিলে পারো!

এবার একটু অবাক হতে হল। আজকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে কর্নেল কোনো রহস্যের লেজ দেখতে পেয়েছেন নাকি? কাগজটা তুলে নিয়ে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামে পর-পর দুটো বিজ্ঞাপন আছে। প্রথমটা এই ঃ

*'বাবা অমু! তুমি শীঘ্র বাড়ি ফিরে এস। তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। টাকার দরকার হলে টেলিফোনে জানাও। —বাবা'*

দ্বিতীয়টা এই ঃ

*'পুঁটুদা, তুমি যা চেয়েছিলে তা-ই হবে। যেখানেই থাকো, ফিরে এস।*

এরপর ‘নিখোঁজ’ শিরোনামের তলায় একটি প্যান্ট-হাফশার্ট-পরা বলিষ্ঠ গড়নের ছেলের ছবি। তার নিচে ছাপা হয়েছে :

*‘এই ছবিটি শ্রীমান দীপক কুমার রায়ের। বয়স প্রায় ১৪ বছর। গায়ের রঙ ফর্সা। চিবুকে একটু কাটা দাগ আছে। কেউ এর সন্ধান দিতে পারলে নগদ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার।*

*পীতাম্বর রায়, ৮-১-সি ঘোষপাড়া লেন কলকাতা-৪৬’*

এরপর জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিকদের ছবিসহ বিজ্ঞাপন। কাগজ থেকে মুখ তুলে বললুম, নাঃ! বিজ্ঞাপনের লোকেদের খেয়াল খুশিমতো হেডিং।

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন,—হালদারমশাই ঠিক ধরেছেন। নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ একই ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে কথাদুটোর মানেতে যে একটা তফাত আছে, তা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

হালদারমশাই একটু উত্তেজিত হলেই ওঁর ছুঁচলো গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপে। লক্ষ্য করলুম উনি উত্তেজিত। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন,—হঃ! বুঝছি। যে স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালায়, তার হেডিং দিচ্ছে নিরুদ্দেশ। আর কোনোভাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যারে বাড়িছাড়া কইর‍্যা কেউ বা কারা গুম করে, কিংবা ধরেন, মার্ডার কইর‍্যা ফ্যালে—

ওঁর কথার ওপর বলে উঠলুম,—কী সর্বনাশ! হালদারমশাই! ও সব অলক্ষুণে কথা প্লিজ বলবেন না!

কর্নেল বললেন,—নিখোঁজ ছেলেটির ছবি দেখার পর মার্ডার কথাটা শুনলে সত্যি খারাপ লাগে। কাজেই হালদারমশাই, এ প্রসঙ্গ থাক। হেডিং দুটোর প্রচলিত অর্থ বুঝেছেন, এই যথেষ্ট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে তখনও উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একটু পরে তিনি আস্তে বললেন,—কর্নেলস্যার! কর্নেল হাসলেন,—আপনি কী বলবেন, বুঝতে পেরেছি হালদারমশাই। নিখোঁজ ছেলেটি সম্পর্কে আপনার উৎসাহ জেগেছে।

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—দশ হাজার টাকার জন্য না। আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির হাতে এখন কোনো কেস নাই, এ জন্যও না। কথাটা হইল গিয়া, এমন বিজ্ঞাপন মাইনষে দেয় কখন? যখন পুলিশ দিয়াও কাম হয় না, তখন।

—ঠিক বলেছেন।

—ভদ্রলোকের লগে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা হয়।

—বেশ তো। ঠিকানা দেওয়া আছে। টুকে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর সোয়েটারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খুদে নোটবই এবং

ডটপেন বের করলেন। তারপর পীতাম্বর রায়ের ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন,—কলকাতা ছেচল্লিশ কোন এরিয়া য্যানো?

কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট্ট স্ট্রিট-ডাইরেক্টরি বের করলেন। তারপর পাতা উল্টে দেখে নিয়ে বললেন,—ঠিকানাটা গোবরা এলাকার।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম,—যাকগে। হালদারমশাই তখন দুঃখ করছিলেন, আজকাল রহস্যের খুব আকাল চলেছে দেশে। চুরি ছিনতাই ডাকাতি খুনোখুনি প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু সবই প্রকাশ্যে আর সাদামাটা ব্যাপার। কাকেও মেরে গুম করে ফেলাটাও আর তত রহস্যজনক নয়। কাজেই দেখা যাক, এই ঘটনাটার পেছনে ছুটোছুটি করে উনি যদি কোনো রহস্য খুঁজে পান, মন্দ কী?

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, এইসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে দুজন ভদ্রলোক এসে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। একজনের পরনে প্যান্ট-শার্ট, জ্যাকেট। রাশভারী মধ্যবয়সী মানুষ। অন্যজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি শাল। কর্নেল প্রথমজনের উদ্দেশে বলে উঠলেন,—কী আশ্চর্য! মিঃ অধিকারী যে! বসুন, বসুন! ষষ্ঠী! শিগগির কফি চাই।

মিঃ অধিকারী বললেন,—কিছুদিন থেকেই আসব-আসব করছিলুম। শেষ পর্যন্ত আসতেই হল। আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য। আমাদের রায়গড় স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। গতবছর রিটায়ার করেছেন। কুমুদ! বুঝতেই পারছ ইনি সেই স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এবার কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলুম অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভদ্রলোকের চেহারায় যেন কিছুটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। চোখের তলায় কালচে ছোপ। কপালে ভাঁজ। মুখে ও চোখে বিষণ্ণতা গাঢ় ছাপ ফেলেছে।

মিঃ অধিকারীর পুরো নাম কৃষ্ণকান্ত অধিকারী। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে কর্নেল সায়েব। কথাটা—

কর্নেল দ্রুত বললেন,—জয়ন্ত আমার বিশ্বস্ত। তা ছাড়া সব ব্যাপারে ও আমার সহকারী। কথা যত গোপনীয় হোক, ওর সামনে বলতে দ্বিধা করবেন না।

মিঃ অধিকারী বললেন,—আমি অক্টোবর-নভেম্বর এই দুটো মাস ব্যবসার

কাজে বাইরে ছিলুম। ফিরেছি ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে। তারপর ঘটনাটা শুনে প্রথমে পুলিশ সোর্সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শেষে আপনার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। কুমুদ আমার বাল্যবন্ধু। অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাকে সাহায্যের জন্য যতদূর যেতে হয়, আমি রাজি।

—ঘটনাটা কী?

—কুমুদ! তুমিই বলো। তোমার মুখ থেকেই কর্নেলসায়েবের শোনা উচিত।

কুমুদ একটু কেসে গলা সাফ করে বললেন,—রায়গড়ে তো আপনি গেছেন! একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে খেলার মাঠ আর তার পাশে ঘন জঙ্গলটা সম্ভবত দেখেছেন!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। জঙ্গলটার অদ্ভুত নাম। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আমি অবশ্য কোনোরকম হাড় মট মট করা শব্দ শুনিনি।

মিঃ অধিকারী বললেন,—আপনাকে তো বলেছিলুম, কোনো যুগে কেউ শুকনো গাছে বাতাসের শব্দ শুনে ভূতুড়ে গপ্প রটিয়েছিল। একটা ভূত নাকি হাঁটাচলা করে। আর পায়ের হাড় মট মট করে ভাঙার মতো শব্দ হয়। বোগাস! কুমুদ! সংক্ষেপে বলো এবার।

কুমুদবাবু বললেন,—লক্ষ্মীপুজোর পরদিনের ঘটনা। আমার একটিমাত্র ছেলে। সুদীপ্ত নাম। ডাকনাম দীপু। ক্লাশ টেনের ছাত্র। পড়াশুনা খেলাধুলো সবেতেই ভালো। তবে একটু একরোখা আর দুঃসাহসী। তো অন্যদিনের মতো সেদিন বিকেলে দীপু ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। ওদের খেলার কোনো সময়-অসময় থাকে না। সূর্য ডুবেছে, তখনও ওরা খেলায় মেতে আছে। জঙ্গলের দিকটায় একটা গোলপোস্ট। দীপুর কিকের খুব জোর। তার কিকে বলটা গোলপোস্টের ওপর দিয়ে জঙ্গলের ভেতর পড়েছিল। তাই দীপুই বলটা কুড়িয়ে আনতে জঙ্গলে ঢুকেছিল।

এইসময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন,—কফি খান। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

কুমুদবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও কফির পেয়ালা তুলে নিলেন কৃষ্ণকান্ত বাবুর তাগিদে। কয়েক চুমুক খাওয়ার পর তিনি জোরে শ্বাস ফেলে বললেন,—দীপু জঙ্গলে বল আনতে গেল তো গেলই। আর ফিরল না। আজ জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ। দীপু এখনও ফিরল না।

কর্নেল বললেন,—একটু খুলে বলুন প্লিজ! আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু সব কথা খুলে না বললে তো আমার পক্ষে এক পা এগোনো সম্ভব নয়।

কুমুদবাবু বললেন,—দীপু ফিরছে না দেখে ওর বন্ধুরা প্রথমে ডাকাডাকি করে। সাড়া না পেয়ে ওরা দীপু যেখানে জঙ্গলে ঢুকেছিল, সেখান দিয়ে ঢোকে। তখন জঙ্গলে আঁধার ঘনিয়েছে। অনেক ডাকাডাকি আর খোঁজাখুঁজি করে ওরা ভয় পেয়েছিল। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার থাকতে পারে। কিন্তু বাঘভালুক থাকার কথা শোনা যায় না। ওরা রায়গড়ে ফিরে পাড়ার লোকেদের খবর দেয়। আমিও খবর পেয়ে ছুটে আসি। তারপর টর্চ লাঠিসোটা আর বন্দুক নিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকেছিলুম। তখন শরৎকালে জঙ্গল খুব ঘন। সাপের উৎপাতও স্বাভাবিক।

কুমুদবাবু চুপ করলেন। কর্নেল বললেন,—জঙ্গলটা তো বেশ বড়ো। আপনারা পুরোটাই কি খুঁজেছিলেন?

—না। জঙ্গলের ভেতরে একটা গভীর ডোবা আছে। সেই ডোবার পাড়ে খানিকটা টাটকা রক্ত দেখেছিলুম। আর—

—বলুন!

—আমরা যখন রক্ত দেখছি, তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত—অমানুষিক চিৎকার শুনতে পেয়েছিলুম। না—চিৎকার বলাও যাবে না। চেরা গলায় আর্তনাদ—কিংবা ওইরকম একটা তীক্ষ্ণ কাঁপাকাঁপা হিংস্র শব্দ—শব্দটা একটানা অন্তত একমিনিট ধরে শোনা গেল। কৃষ্ণকান্তের বন্দুক আছে। ওর ভাই বরদা দু'বার ফায়ার করল বন্দুকে। কিন্তু আমরা আর এগোতে সাহস পেলুম না। রক্ত দেখেই ধরে নিয়েছিলুম দীপু কোনো হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে। বাঘ-ভালুকের কথা শোনা যায় না বটে, কিন্তু জঙ্গল তো! কোত্থেকে এসে জুটলেই হল। তবে সেই অমানুষিক চিৎকারটা কোন্ জানোয়ারের, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি।

—তারপর আপনারা কী করলেন?

—সে রাত্রে থানায় খবর দিলুম। পুলিশ রাত্রে জঙ্গলে ঢুকতে রাজি হয়নি। সকালে থানার কজন সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে বড়বাবু ডোবার পাড়ে রক্ত দেখেই বললেন,—দীপুকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাকার লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারা জঙ্গল তোলপাড় করল। কিন্তু দীপুর চিহ্নটুকু খুঁজে পাওয়া গেল না।

কর্নেল কুমুদবাবুর কথা শোনার পর বললেন,—এটাই যদি ঘটনা হয়, তা হলে মিঃ অধিকারী, আপনি নিশ্চয় আমার কাছে আসতেন না।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন কর্নেলসায়েব! কুমুদ! এবার বাকি অংশটা বলো।

কুমুদবাবু বললেন,—দিন দশেক পরে পোস্টম্যান একটা খাম দিয়ে গেল।

খামের ওপরে ইংরেজিতে আমার নাম ঠিকানা লেখা ছিল! কিন্তু ভেতরে ছিল শুধু একটা রঙিন ফোটো। ফোটোটা দীপুর।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনার নিখোঁজ ছেলের ফোটো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি অবাক হয়েছিলুম। ফোটোটা উল্টে দেখে আরও অবাক হলুম। পিছনে লাল কালিতে লেখা আছে : দীপু বেঁচে আছে। সময় হলেই বাড়ি ফিরবে।

মিঃ অধিকারী বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার! কুমুদ নিজের ছেলের হাতের লেখা চেনে। খামের ওপর ইংরেজি লেখা আর ফোটোর পিছনে বাংলায় লেখা নাকি দীপুর নয়।

কুমুদবাবু বললেন,—হ্যাঁ। দীপুর লেখা হয়। অন্য কেউ লিখেছে।

মিঃ অধিকারী বললেন,—খাম আর ফোটোটা কর্নেলসায়েবকে দাও কুমুদ!

কুমুদবাবু বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খাম থেকে ফোটোটা বের করে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন,—হুঁ। তারপর?

কুমুদবাবু বললেন,—এর কদিন পরে আবার একটা খাম এল ডাকে। একই হাতের লেখা এবার শুধু একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

মিঃ অধিকারী বললেন,—চিঠিটা বরং কর্নেলসায়েবকে দাও।

কুমুদবাবু পকেট থেকে আর একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠিটা বের করে মৃদুস্বরে পড়তে থাকলেন :

*'দীপুর পড়ার টেবিলে ড্রয়ারের মধ্যে খুঁজে দেখুন একটা অঙ্কের ধাঁধা লেখা আছে। ধাঁধার চারদিকে ৩২ লেখা আছে দেখতে পাবেন। যদি ওটা ড্রয়ারে না থাকে ওর বই আর খাতাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয় ওটা পাবেন। পেয়ে গেলে ধাঁধার কাগজটা খামে ভরে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে ডোবার দক্ষিণপাড়ে একটুকরো ঢিল চাপা দিয়ে গোপনে রেখে আসবেন। সাবধান! পুলিশ কিংবা অন্য কাকেও ঘূণাক্ষরে একথা জানাবেন না। কিংবা নিজেও সেখানে গোপনে লক্ষ্য রাখবেন না। তা হলে দীপুকে আর ফিরে পাবেন না।'*

পড়া শেষ করে কর্নেল বললেন,—ধাঁধাটা পেয়েছিলেন?

—আজ্ঞে না। অগত্যা কী করব, অনেক ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখে জঙ্গলের ভেতর ডোবার পাড়ে রেখে এসেছিলুম। লিখেছিলুম, ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে আরও দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক।

—তারপর?

ঠিক দু'সপ্তাহ পরে আবার একটা চিঠি এল ডাকে। ওটা পেয়েছি কিনা জানতে চেয়েছে। —বলে কুমুদবাবু আবার একটা খাম কর্নেলকে দিলেন।

মিঃ অধিকারী বললেন,—কুমুদ আবার সময় চেয়ে চিঠি রেখে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে আমি হংকং থেকে ফিরলুম। কুমুদ আমাকে সব ঘটনা বলল। তখন আমাদের রেঞ্জের পুলিশের ডি.আই. জি. সুকুমার ভদ্রের কাছে কুমুদকে নিয়ে গেলুম। মিঃ ভদ্র হেসে উড়িয়ে দিলেন। পাত্তাই দিলেন না। বললেন,—ছেলে বাবার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দীপু ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে।

কুমুদবাবু বললেন,—ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, দীপু তেমন ছেলে নয়। জঙ্গলে রক্তের ব্যাপারটাও ডি.আই.জি. সায়েব গ্রাহ্য করলেন না। বললেন,—তাঁর কাছে এই কেসে রায়গড় থানার পুলিশ-রিপোর্ট আছে। ডোবাটার কাছে আদিবাসীদের ওঝারা নাকি গোপনে মুর্গি বলি দেয়।

মিঃ অধিকারী বললেন,—সেটা অবশ্য ঠিক। জঙ্গলের পূর্বে আদিবাসী বস্তি আছে। ছোটবেলায় দেখেছি ওরা জঙ্গলে গিয়ে ধামসা বাজিয়ে নাচ-গান করে পুজো দিত। আজকাল ওরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তা বলেও পুরনো প্রথা কেউ গোপনে মেনে চলতেই পারে। যাই হোক, কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, দীপুর অন্তর্ধান রহস্যের একটা কিনারা করুন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। তারপর বললুম,—রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা কর্নেল! বিশেষ করে অঙ্কের ধাঁধা এবং ৩২ সংখ্যাটার মধ্যে নিশ্চয় কোনো মূল্যবান জিনিসের সম্পর্ক আছে।

কর্নেল দীপুর ফোটোটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে 'নিখোঁজ' শীর্ষক ছবিটা দেখতে থাকলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাঁচ বের করে দুটো ছবি মিলিয়ে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন,—বত্রিশের ধাঁধার আর একটা দিক খুবই অদ্ভুত জয়ন্ত! খবরের কাগজে ছাপা নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের ছবি আর রায়গড়ের কুমুদবাবুর নিখোঁজ ছেলে সুদীপ্ত ওরফে দীপুর ছবি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

চমকে উঠে বললুম,—দেখি, দেখি।

তারপর ছবিদুটো দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। দুটো ছবিই একজনের!

## ॥ দুই ॥

কর্নেল আতস কাঁচে বিজ্ঞাপনের ছবি আর সেই ফোটোটা আরো কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর এদিনের আরো কয়েকটা ইংরেজি ও বাংলা খবরের

কাগজ খুলে বিজ্ঞাপনগুলো দেখার পর বললেন,—নাঃ! পীতাম্বর রায় শুধু তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় দীপুর ছবিসহ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন।

বললুম,—কিন্তু শুধু একটা কাগজে কেন? নিখোঁজ দীপুর জন্য যিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চান, তাঁর পক্ষে অন্য কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল।... অন্তত একটা ইংরেজি কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল না কি?

কর্নেল সায় দিলেন,—অবশ্যই ছিল।

বলে তিনি একটু হাসলেন,—এমন হতে পারে, পীতাম্বর রায় ধরেই নিয়েছেন, বহুলপ্রচারিত এবং জনপ্রিয় একটা বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই যথেষ্ট।

—আমার আরো একটা ব্যাপারে অবাক লাগছে কর্নেল!

—বলো!

—রায়গড়েও নিশ্চয়ই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা যায়।

—যাওয়া স্বাভাবিক। তবে এদিনের কাগজ সেখানে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাওয়ার কথা।

—না—আমি বলতে চাইছি, দীপুর বাবা আর তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকান্তবাবু কলকাতা আসার পথে কি খবরের কাগজ পড়েন নি? বিশেষ করে দৈনিক সত্যসেবকের মতো জনপ্রিয় কাগজ!

—পড়েন নি। অথবা পড়লেও বিজ্ঞাপনটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা না হলে কথাটা তাঁরা বলতেন।

—আমার ধারণা, রায়গড়ে পৌঁছে ওঁরা সেখানকার কারো কাছে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা জানতে পারবেন। কারো না কারো চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়তে বাধ্য।

—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ।

বলে কর্নেল কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনটা কেটে নিলেন এবং উল্টো পিঠে পত্রিকার নাম ও তারিখ লাল ডটপেনে লিখে রাখলেন। তারপর টেবিলের নিচের ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বের করে বিজ্ঞাপন, ফোটো এবং দীপুর বাবার দিয়ে যাওয়া সেই চিঠি দুটো তাতে ভরে রাখলেন।

সেই সময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল। বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, এই বিজ্ঞাপনদাতা পীতাম্বর রায় দীপুর বাবা কুমুদবাবুর কোনো আত্মীয় নন-তো? হয়তো কুমুদবাবুর কাছে কোনো সূত্রে খবর পেয়ে তিনি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন!

কর্নেল খামটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকাচ্ছিলেন। বললেন,—কিন্তু পীতাম্বর

রায় বিজ্ঞাপনে দীপুকে দীপককুমার রায় করেছেন। এদিকে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নাম সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বা সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য।

বললুম,—ধরা যাক, পীতাম্বর রায় কুমুদবাবুর আত্মীয় নন। হিতৈষী বন্ধু। সুদীপ্ত শুনতে দীপক শুনেছিলেন।

কর্নেল হাসলেন,—সাবধান জয়ন্ত! তুমি একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছ। বরং আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে ঘিলু চাঙ্গা করো!

বলে তিনি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী! কফি।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে খেতে এতক্ষণে আমার মনে পড়ল প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কথা। বললুম,—হালদারমশাই এতক্ষণে নিশ্চয় গোবরা এলাকা চষে পীতাম্বর রায়কে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। দেখা যাক, তিনি কোন্ খবর আনেন।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। এতক্ষণে তুমি গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছ।

—তার মানে, হালদারমশাই দীপুর অন্তর্ধানরহস্য একা-একা ফাঁস করে ফেলবেন বলছেন? আপনাকে নাক গলাতে হবে না?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল চোখ না খুলে বললেন,—ফোন ধরো জয়ন্ত!

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—কর্নেলস্যার!

দ্রুত বললুম,—বলুন হালদারমশাই!

—জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলস্যার কী করতাছেন?

—ধ্যানে বসেছেন। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন? অমন হাঁসফাঁস করেই বা কথা বলছেন কেন?

কর্নেল আমার হাত থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—বলুন হালদারমশাই!... হ্যাঁ।... তারপর?... বলেন কী?... আপনি বরং আমার এখানে চলে আসুন।... ঠিক বলেছেন। রাখছি।

বললুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তোমার রসিকতা করার বদঅভ্যাস আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রসিকতা সঙ্গত নয়। বিশেষ করে উনি যখন রীতিমতো মল্লযুদ্ধ করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আমাকে টেলিফোন করছেন।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—মল্লযুদ্ধ মানে?

—হালদারমশাইয়ের মুখে সে-সব কথা শুনতে পাবে।

একটু বিব্রত হয়ে বললুম,—কিন্তু আমি তা কেমন করে জানব? তা ছাড়া আমি ওঁর সঙ্গে কিন্তু রসিকতা করি নি।

—তোমার কণ্ঠস্বরে রসিকতার আভাস ছিল।

—সরি!

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—না, না। সরি বলার মতো কিছু করো নি তুমি। তবে তৈরি থাকো। হালদারমশাই তোমার জন্য আর একটা গোলকধাঁধা নিয়ে আসছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর এলেন প্রায় মিনিট কুড়ি পরে। চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সোফায় ধপাস করে বসে বললেন,—ফায়ার আর্মস লইয়া যাই নাই। ভুল করছিলাম।

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খান। তারপর ওসব কথা। ষষ্ঠী! হালদারমশাইয়ের জন্য কফি নিয়ে আয়।

এবার লক্ষ করলুম, হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে জায়গায়-জায়গায় কালচে ছোপ। প্যান্টের নিচের দিকটা ভিজে গেছে। আঙুলে ব্যান্ডেজ। তার মানে, কারো সঙ্গে মল্লযুদ্ধটা বেশ জোরালো হয়ে গেছে।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে হালদারমশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। হালদারমশাই যথারীতি ফুঁ দিয়ে কফি পান করতে থাকলেন।

তারপর হঠাৎ খি খি করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন,—কী কাণ্ড! ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ্ দ্যাখে নাই। ড্রেনে অরে ফ্যালাইয়া দুই পাঁও দিয়ে রগড়াইছি!

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খেয়ে নিন হালদারমশাই!

গোয়েন্দামশাই এবার তারিয়ে-তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। কফি শেষ হলে তিনি অভ্যাসমতো একটিপ নস্যি নিলেন, তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই ঃ

ঘোষপাড়া লেন একটা ঘিঞ্জি গলি। দুধারে খোলা নর্দমা। গলিটা শেষ হয়েছে একটা কারখানার দেওয়ালে। ৮/১/সি নম্বরে একটা মান্ধাতা আমলের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার দোতলায় একটা মেস আছে। মেসের তিনটে ঘরে যারা থাকে, তাদের নানারকমের পেশা। কেউ বেসরকারি অফিসের কর্মী, কেউ ড্রাইভার, কেউ খবরের কাগজের হকার। বাঙালি-অবাঙালি দুই-ই আছে। রবিবারে মেসের বাসিন্দারা কে-কোথায় বেরিয়েছে। দোতলার ছাদে একটা টিনের শেডে ঢাকা ঘরে রান্না হয়। হালদারমশাই মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়ার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এ সব খবর পান।

তো তিনি গেছেন পীতাম্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পীতাম্বরবাবু প্রতি শনিবার বিকেলে অফিস থেকে সোজা দেশের বাড়িতে চলে যান! সোমবার সেখান থেকে ফিরে অফিসে যান। তারপর মেসে ফেরেন সন্ধ্যাবেলায়। কোনো-কোনো দিন রাত নটাও বেজে যায়। পীতাম্বরবাবু যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে থাকে জনৈক রমেশ শর্মা। রমেশ কোন ব্যবসায়ীর গাড়ির ড্রাইভার।

কথায়-কথায় হালদারমশাই পীতাম্বরবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানা জানতে চান। ম্যানেজার আদিনাথবাবু মেসের রেজিস্টার খুলে ঠিকানাটা লিখে দেন। তারপর হালদারমশাইয়ের চোখে পড়ে, আদিনাথবাবুর টেবিলে আজকের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়ে আছে।

খবরের কাগজটা পড়ার ছলে হালদারমশাই আদিনাথবাবুকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন,—এ কী! পীতাম্বরবাবুর ছেলে নিখোঁজ নাকি? বিজ্ঞাপনটা দেখে আদিনাথবাবু খুব অবাক হয়ে যান। কারণ পীতাম্বরবাবু এমন একটা ঘটনার কথা তাঁকে জানান নি!

দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন বারান্দায় কেউ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আদিনাথবাবু টের পেয়ে তাকে ডেকে বলেন,—কী গোবিন্দ? ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? এখানে এস।

কথাটা বলে আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে ইশারায় জানিয়ে দেন, এই ছোকরা এ পাড়ার এক মস্তান। গোবিন্দ ঘরে না ঢুকে এবং কোনো কথা না বলে চলে যায়। তখন আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে বলেন, আপনার বন্ধু পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে এই গুণ্ডামাস্তানটার খুব ভাব। পীতাম্বরবাবুকে সতর্ক করে দিয়েছিলুম। কিন্তু কথা কানে নেন নি। পীতাম্বরবাবু আপনার বন্ধু বটে, কিন্তু খুলেই বলছি, ওঁর হাবভাব আমার মোটেও পছন্দ হয় না। আমার ধারণা, পীতাম্বরবাবুর ছেলে বা ছোটভাই—যেই হোক, তার নিখোঁজ হওয়ার জন্য উনি নিজেই দায়ী।

বিচক্ষণ হালদারমশাই আর কথা না বাড়িয়ে মেসের ফোন নম্বর জেনে নিয়ে চলে আসেন। তারপর নির্জন গলিতে সেই গোবিন্দের মুখোমুখি পড়ে তার সঙ্গে পীতাম্বরবাবুর কথা তুলে ভাব জমাতে চেষ্টা করেন। তখনই ঘটে যায় অঘটন। হঠাৎ গোবিন্দ প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাকু বের করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হালদারমশাই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। এমন অবস্থায় পুলিশজীবনে বহুবার পড়েছেন। তিনি গোবিন্দের পায়ে জোরে লাথি মারেন। গোবিন্দ নোংরা ড্রেনে পড়ে যায়। তারপর হালদারমশাই তার চাকুটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দৈবাৎ তাঁর বড়ো আঙুলের নিচে একটু কেটে যায়। তবে চাকুটা তিনি করায়ত্ত করেছিলেন।

ততক্ষণে একজন-দুজন করে লোক জড়ো হয়েছিল গলিতে। তারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিল। কেউ এগিয়ে আসে নি। হালদারমশাই চলে আসার আগে গোবিন্দের মুখে জুতোসুদ্ধ চাপ দিয়ে ড্রেনের নোংরা জল আর আবর্জনায় অন্তত দুমিনিট ডুবিয়ে রেখে হনহন করে চলে আসেন। আর পিছু ফেরেন নি।

সদর রাস্তায় একটা ফার্মেসিতে ব্যান্ডেজ কিনে গোয়েন্দাপ্রবর ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি কর্নেলকে ফোন করেছিলেন।

হালদারমশাই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্প্রিংয়ের চাকুটি দেখালেন। বাঁটের কাছে একটু চাপ দিতেই প্রায় চারইঞ্চি ফলা বেরিয়ে এল। দেখেই আঁতকে উঠলুম।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন,—পীতাম্বর রায়ের দেশের বাড়ির ঠিকানাটা এবার দিন হালদারমশাই! ঠিকানাটা সম্ভবত বর্ধমান জেলার রায়গড়।

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করতে গিয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর চোখদুটো গুলিগুলি হয়ে উঠল। উত্তেজনায় গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপতে থাকল। তিনি বলে উঠলেন,—আপনি ক্যামনে জানলেন?

কর্নেল কাগজটা নিয়ে বললেন,—নিছক অনুমান।

গোয়েন্দাপ্রবর আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—কী কাণ্ড!

বললুম,—এই কাণ্ডের পিছনে একটা বড় কাণ্ড আছে হালদারমশাই!

হালদারমশাই আমার দিকে সেইরকম গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন,—কন কী?

কর্নেল হাসতে হাতে বললেন,—জয়ন্ত আপনাকে রসিকতা করছে। ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার কাজ আপনি করে যান।

তা করব। —হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন,—পীতাম্বরবাবু অমন আনসোশ্যাল হারামজাদারে ক্যান বহাল করছেন, এই রহস্য জানা দরকার। আমি পীতাম্বরবাবুর লগে দেখা করতে গিছ্লাম। গোবিন্দ ক্যান শুধু এইজন্যই আমারে স্ট্যাব করার চেষ্টা করল? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এক্কেরে ব্যাবাক তালগোল পাকাইয়া গেছে।

—প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে আপনার তো লাইসেন্স আছে। দরকার মনে করলে আপনি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন।

হালদারমশাই একটু হেসে বললেন,—পুলিশের সাহায্য আমার লাগবে না কর্নেলস্যার! আমার প্ল্যান কী, তা আপনারে জানাইয়া দিই।

—হ্যাঁ। আমাকে না জানিয়ে কিছু করবেন না যেন।

কখনও করছি কি? —বলে হালদারমশাই সোয়েটারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলেন। তারপর বললেন, পীতাম্বরবাবুর মেসের ফোন নম্বর লইছি। কাল সোমবার রাত্রে ওনারে ফোন করব। তারপর ওনারে বলব, নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের খোঁজ আমি পাইছি। আপনি শিগগির সাক্ষাৎ করুন। আমি ওনারে গণেশ অ্যাভেনিউয়ে আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতেই আইতে বলব।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন,—তার মানে, আপনি যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তা পীতাম্বরবাবুকে জানাবেন?

—হঃ!

—বাঃ! আপনার প্ল্যানটা চমৎকার। এ ধরনের কেসে প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাক গলানো তো স্বাভাবিক।

বললুম,—পীতাম্বরবাবু আপনার কাছে যাবেন বলে মনে হয় না!

হালদারমশাই হাসলেন,—না আইতে চাইলে অরে থ্রেটন্ করব। পুলিশের ভয় দেখাব।

কর্নেল বললেন,—আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মক্কেলের ফোটো তুলে রাখেন। তাই না? আমার দরকার পীতাম্বর রায়ের একটা ছবি।

গোয়েন্দাপ্রবর আশ্বাস দিলেন,—পীতাম্বর রায়ের ছবি আপনি পাইবেন কর্নেলস্যার! যে ভাবেই হোক, অরে মিট করব। ছবিও তুলব।

—ওঁদের মেসের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন।

হালদারমশাই নোটবই থেকে নাম্বারটা কর্নেলকে দিলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন,—বর্ধমান জেলার রায়গড়ের নাম কইলেন তখন। ব্যাপারটার এট্টুকখানি হিন্ট দিন কর্নেলস্যার!

কর্নেল চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভালেন। তারপর বললেন,—আপাতত আপনাকে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখছি, রায়গড়ে আমি বার-দুয়েক গিয়েছিলুম। প্রথমবার গিয়েছিলুম প্রায় পাঁচবছর আগে। ওখানে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আর আছে একটা গভীর জঙ্গল। তো আমি গিয়েছিলুম আমার এক বন্ধু ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে। ডঃ চট্টরাজ কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের একজন কর্মকর্তা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ খোঁড়াখুঁড়ি করে তাঁর একটা টিম প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিল। আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমারও কিছু [illegible] আছে। যাই হোক, সেখানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নামে একজন বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাঁর হেড অফিস আসানসোলে। রায়গড়ে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। রায়গড়ের জঙ্গলে তাঁর

সঙ্গে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলুম। মিঃ অধিকারী তরুণ বয়সে দক্ষ শিকারি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বিরল প্রজাতির কিছু পাখির ছবি তুলেছিলুম। পরের বছর মিঃ অধিকারী কলকাতায় নিজের কাজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবার আসল কথাটা বলি। ওই জঙ্গলটার নাম হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। কারণ রাতবিরেতে ওই জঙ্গলে হাড় মট মট করে কোনো অদ্ভুত জন্তু অথবা ভূতপ্রেত নাকি ঘুরে বেড়ায়। এই রহস্য ফাঁস করার উদ্দেশ্যেই আমি মিঃ অধিকারীর সঙ্গে আবার রায়গড়ে গিয়েছিলুম।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—হাড়মটমটির শব্দ শুনছিলেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—গিয়েছিলুম মার্চ মাসে। তখন রাতবিরেতে জোরে বাতাস বয়। অনেক অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলুম, তা ঠিক। তবে হাড়মটমটিয়ার রহস্য রহস্যই থেকে গেছে।

—পীতাম্বর রায়ের বাড়ি রায়গড়ে—আপনিই কইলেন। অরে চেনেন?

নাঃ। তবে নামটা যেন শুনেছিলুম। —বলে কর্নেল আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টে তাকালেন।

বুঝলুম, আমি যেন এখনই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের কাছে ফাঁস না করি। আমি একটা পত্রিকা পড়ার ভান করলুম।

হালদারমশাই বললেন,—আমি এবার যাই কর্নেলস্যার! যেভাবে হোক, পীতাম্বর রায়েরে মিট করব। অর ছবি তুলব।

—কিন্তু এবার একটু সতর্ক থাকবেন যেন!

—হঃ। লাইসেন্সড রিভলভার আছে। সাথে রাখুম।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললুম,—ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি হালদারমশাইকে জানালেন না কেন?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—জানালে উনি এখনই রায়গড়ে ছুটে যেতেন। আপাতত আমি পীতাম্বর রায়ের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই। কেন সে অমন বিজ্ঞাপন দিল, তা আমার জানা দরকার।

এইসময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। বললুম,—আচ্ছা কর্নেল! আপনি রায়গড়ে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কথা বললেন। দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সঙ্গে সেখানকার কোনো দামি প্রত্নদ্রব্যের সম্পর্ক নেই তো?

কর্নেল আমাকে চমকে দিয়ে বললেন,—আছে। সম্ভবত সেটাই বত্রিশের ধাঁধা।

## ॥ তিন ॥

রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত কোনও প্রত্নদ্রব্যের সঙ্গে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সম্পর্ক আছে শুনে কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তাঁকে এখন বড়বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কথাটা বলে তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন।

একটু পরে বললুম,—দীপুর অন্তর্ধানের কারণ সম্পর্কে আপনি তা হলে দেখছি একেবারে নিশ্চিত?

কর্নেল গলার ভেতরে বললেন,—হুঁ।

—কিন্তু সেই প্রত্নদ্রব্যটা কী?

ওটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ডঃ চট্টরাজের কাছে শুনেছিলুম। একটা ছোট্ট বাকসের মতো জিনিসটার গড়ন। কিন্তু বাকসো নয়। তা ছাড়া ওটা কোনও অজানা ধাতুতে তৈরি। —বলে কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন : আশ্চর্য ঘটনা! ওটা ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি বলছিলেন, সম্ভবত বত্রিশের ধাঁধার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে।

—সম্ভবত বলার কারণ, ডঃ চট্টরাজ বলেছিলেন, চৌকো গড়নের কালো জিনিসটার গায়ে খুদে হরফে কী সব লেখা ছিল। দেখতে নাকি নাগরী লিপির মতো। ওটা পরিষ্কার করার সময় দেয়নি চোর। তবে ডঃ চট্টরাজ ওটার ওপরের দিকে নাগরী লিপিতে ৩ এবং ২ এদুটো সংখ্যা অনুমান করেছিলেন। নেহাতই অনুমান। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই পড়েছিলেন।

—ডঃ চট্টরাজ এই চুরির কথা পুলিশকে জানান নি?

—আমি নিষেধ করেছিলুম। কারণ এতে একটা হইচই শুরু হত। ডঃ চট্টরাজকেও পুরাতত্ত্ব দফতরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হত। তাঁর সুনামহানিরও আশঙ্কা ছিল।

—আপনি তো তখন সেখানে ছিলেন!

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমি সেদিন ওখানে ছিলুম না। কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর সঙ্গে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তবে ওখানে থাকলেও চোর ধরা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডঃ চট্টরাজের দলে ছিলেন দশ-বারো জন লোক। আর খোঁড়াখুঁড়ির কাজে স্থানীয় কয়েকজন মজুরের সাহায্য দরকার হয়েছিল। মিঃ অধিকারীই সেইসব মজুর জোগাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিরক্ষর। এ ছাড়া এলাকার লোকেরাও রোজ এসে ভিড় করত। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার পক্ষে ব্যাপারটা ছিল খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। তার চেয়ে বড় কথা, চুরি যাওয়া জিনিসটাকে তত গুরুত্ব দেননি ডঃ চট্টরাজ।

হাসতে হাসতে বললুম,—তা হলে এবার জিনিসটার গুরুত্ব খুব বেড়ে গেল।

কর্নেল হাসলেন না। তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ। ডঃ চট্টরাজ গত বছর রিটায়ার করেছেন। যাদবপুরে থাকেন। দেখি, ওঁকে পাই কিনা।

বলে কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন,—ডঃ চট্টরাজ আছেন?... আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইলিয়ট রোড থেকে বলছি।... বাইরে গেছেন? মানে, কলকাতার বাইরে?... কবে ফিরবেন?... বলে যাননি? আপনি কে বলছেন? হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

রিসিভার রেখে কর্নেল বিরক্ত মুখে বললেন,—অদ্ভুত লোক! সম্ভবত নতুন কোনও কাজের লোক। ডঃ চট্টরাজের পুরাতন ভৃত্য পরেশ আমাকে চেনে। এই লোকটার গলার স্বর যেমন কর্কশ, কথাবার্তাও তেমনই উদ্ধত প্রকৃতির লোকের মতো।

—ডঃ চট্টরাজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে তো আছেন। আপনি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—ওঁর স্ত্রী বেঁচে নেই। ছেলে থাকে অ্যামেরিকায়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লিতে। মেয়ে-জামাই দুজনেই বিজ্ঞানী। যাদবপুরের বাড়িতে ডঃ চট্টরাজ একা থাকেন।

বলে তিনি আবার হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। দাঁতের ফাঁকে রাখা জ্বলন্ত চুরুটের নীল ধোঁয়া আঁকাবাঁকা হয়ে তাঁর চওড়া মসৃণ টাকের ওপর নাচতে নাচতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তবে এতক্ষণে বুঝলুম,—বৃদ্ধ রহস্যভেদী পাঁচ বছর আগেকার রায়গড়ের স্মৃতির মধ্যে আরও কোনও সূত্র খোঁজাখুঁজি করছেন।

বললুম,—আমি এবার উঠি। দেড়টা বাজে।

কর্নেল আগের মতো গলার ভেতর বললেন,—উঁ?

আপনি ধ্যান করবেন। আমি চুপচাপ বসে থাকব। এর মানে হয় না। —বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সেই সময় ষষ্ঠীচরণ ভেতরের দরজায় পর্দার ফাঁকে মুখ বের করে সহাস্যে বললো,—দাদাবাবু? আপনার এ বেলা নেমন্তন্ন।

অমনই কর্নেলের ধ্যানভঙ্গ হল। চোখ কটমটিয়ে ষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমরা খাব।

ষষ্ঠী বললো,—সব রেডি বাবামশাই!

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত কি স্নান করতে চাও? আমার মতে, এই শীতের অবেলায় স্নান করলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বালা হবে। চলো। খেয়ে নেওয়া যাক।

খাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে এসে কর্নেল বললেন,—কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরুব।

বললুম,—পীতাম্বর রায়ের সেই মেসে যাবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—নাঃ! ওই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের হাতেই থাক্। চাকু হারিয়ে সেই গোবিন্দ এখন ভোজালি জোগাড় করে ফেলেছে।

—গোবিন্দের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। হালদারমশাইয়ের ওপর সে আচমকা চড়াও হল কেন?

—প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় ওঁকে ডিটেলস জানাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিনি। আমার ধারণা, মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়াকে হালদারমশাই নিশ্চয় মুখ ফসকে এমন কোনও কথা বলে ফেলেছিলেন, যা গোবিন্দের কানে গিয়েছিল। হালদারমশাইয়ের হঠকারী স্বভাবের কথা তুমি তো জানো!

একটু পরে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগেছে।

—বলো!

—রায়গড়ের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে যে চৌকো কালো জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটার কথা কি ডঃ চট্টরাজের কলিগরা জানতেন না? জানলে তো তাঁরা সরকারি রিপোর্টে কথাটা উল্লেখ করতে বলতেন! আমি যতটা জানি, এসব রিপোর্টে পুরো টিমের সই থাকে।

—তুমি ঠিক বলেছ। উৎখননে পাওয়া প্রতিটি জিনিসের তালিকাও করা হয়। তাতেও পুরাতাত্ত্বিক দলের সদস্যদের সই থাকে। কিন্তু ডঃ চট্টরাজ আমাকে গোপনে জানিয়েছিলেন, ওই জিনিসটা উনি দৈবাৎ কুড়িয়ে পান। ওটার কোনও গুরুত্ব আছে বলে ওঁর মনে হয়নি। তাই দলের কাকেও বলেননি।

—অথচ ওটা ওঁর ক্যাম্প থেকে চুরি গেল!

—হ্যাঁ। স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিতে নিতে আজ আমার মনে হল, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

—আপনি তখন বলছিলেন বটে! কিন্তু আশ্চর্য কেন?

—ডঃ চট্টরাজ তারপর যখন জিনিসটার গুরুত্ব টের পেলেন, তখন ওটা অসাবধানে রাখলেন কেন?... ঠিক এই কথাটা ওঁকে জিজ্ঞেস করে কোনও সদুত্তর পাইনি।

—আজ কি তাই ওঁকে তখন ফোন করলেন?

—হ্যাঁ। তুমি বুঝতেই পারছ, এতদিন পরে সেই চুরি যাওয়া জিনিসটাকে কেন্দ্র করে একটা জমজমাট রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। কাজেই ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলা এখন কত জরুরি। অথচ উনি নাকি বাইরে গেছেন।

কর্নেলকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আধপোড়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—এক মিনিট। আমি পোশাক বদলে আসি।

বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার গাড়ি নিচে পার্ক করা ছিল। কর্নেল সামনের সিটে আমার বাঁদিকে বসে বললেন,—হাজরা রোডের দিকে চলো। তারপর আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম,—অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই যাচ্ছেন। কার কাছে?

কর্নেল হাসলেন,—চলো তো!

হাজরা রোডে পৌঁছে কর্নেলের নির্দেশে কিছুদূর চলার পর ডানদিকে একটা সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেলুম। তারপর এক জায়গায় তিনি আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন, দেখলাম বাঁদিকে একটা চওড়া গেট। ওপারে বুগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। কর্নেল নেমে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর একটা লোক গেট খুলে দিল। কর্নেল ইশারায় আমাকে গাড়ি ভেতরে ঢোকাতে বললেন।

গাড়ি ঘুরিয়ে ঢালু ফুটপাত দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় চোখে পড়ল, মার্বেলফলকে লেখা আছে 'রায়গড় রাজবাটি'। দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠলুম।

নুড়িবিছানো লনের অবস্থা, আগাছায় ঢাকা ফুলের গাছ, শুকনো ফোয়ারার শীর্ষে ভাঙাচোরা একটা মূর্তি এবং দোতলা পুরনো বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাড়িটার স্থাপত্যে ইতালীয় ধাঁচ। বড়-বড় থাম এবং জানালা। পোর্টিকোর তলায় গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালুম। কর্নেল ততক্ষণে সেই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রকাণ্ড দরজার সামনে পৌঁছে গেছেন। লোকটা ঘরের ভেতর দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

বললুম,—কী আশ্চর্য!

কর্নেল বললেন,—তোমাকে একটু চমক দিয়ে আনন্দ পেলুম। এস।

ওপরতলায় এতক্ষণে কুকুরের গর্জন শুনতে পেলুম। বললুম,—সর্বনাশ! কুকুরটা ছেড়ে দেওয়া নেই তো?

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই লোকটি হলঘরের সিঁড়িতে নামতে নামতে বলল,—যান সার! কুমারবাহাদুর ওপরের বারান্দায় আছেন। উনি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কাঠের সিঁড়িতে বিবর্ণ লালচে কার্পেট পাতা আছে। হলঘরের মেঝেতেও আছে। এ ধরনের অনেক বনেদি অভিজাত পরিবারের বাড়িতে কর্নেলের সঙ্গে কতবার এসেছি।

চওড়া এবং লম্বাটে বারান্দার মাঝখানে বৃত্তাকার একটা অংশ। সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হুইলচেয়ারে বসে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে সহাস্যে

বললেন,—আসুন! আজ ঘুম থেকে ওঠার পর কেন যেন মনে হচ্ছিল, আপনি আসবেন।

বলে তিনি হাঁক দিলেন,—মধু! রেক্সিটা বড্ড চ্যাঁচাচ্ছে। ওকে নিচে নিয়ে যা। আর সাবিত্রীকে বল্, কর্নেলসায়েব এসেছেন। কফিটফি চাই।

কোণের একটা ঘর থেকে কালো দানোর মতো একটা গুঁফো লোক বেরিয়ে এসে কর্নেলকে সেলাম ঠুকল। তারপর কুকুরটার চেন খুলে নিচে নিয়ে গেল।

আমরা কুমারবাহাদুরের মুখোমুখি বসলুম। কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারবাহাদুরের নাম অজয়েন্দু নারায়ণ রায়। একসময় এঁরই পূর্বপুরুষ রায়গড় পরগণার রাজা ছিলেন। চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ আছে। কথায়-কথায় জানতে পারলুম, বছর দশেক আগে সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। দুটো পা-ই অকেজো হয়ে গেছে। তাই হুইলচেয়ারে বসে দোতলায় চলাফেরা করেন। নিচে নামেন না।

মধুর মতো তাগড়াই চেহারার এক প্রৌঢ়া কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। সে কর্নেলের দিকে ঝুঁকে প্রণামও করল। কর্নেল বললেন,—কেমন আছ সাবিত্রী? দেশে যাও-টাও তো?

সাবিত্রী আস্তে বলল,—আর কার কাছে যাব কর্নেলসায়েব? একটা ভাই ছিল। সে দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে।

সে চলে গেলে কুমারবাহাদুর বললেন,—আর সে-রায়গড় নেই। মাঝেসাঝে ওখানকার কেউ-কেউ এসে দেখা করে যায়। হ্যাঁ—আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। কলেজ হয়েছে। কিন্তু দলাদলি হাঙ্গামা নাকি বেড়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—গত লক্ষ্মীপুজোর সময় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের কাছে ফুটবল খেলতে গিয়ে—

হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে কুমারবাহাদুর বললেন,—শুনেছি। গতমাসে কেষ্ট অধিকারী এসেছিল। আপনার সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে বলছিল। খুব পয়সা করেছে কেষ্ট। বলছিল, হংকং ঘুরে এসেছে সদ্য।

—দীপু নামে যে ছেলেটি নিখোঁজ হয়েছে, তার বাবা কুমুদ ভট্টাচার্যকে কি আপনি চেনেন?

—চিনব না মানে? আমার সুপারিশেই তো কুমুদ মাস্টারি পেয়েছিল। তা প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমি রায়গড়ের এম.এল.এ. ছিলুম। কেষ্ট বলছিল, কুমুদ রিটায়ার করেছে। এদিকে ওর ছেলে হঠাৎ

জঙ্গলের ভেতর নিখোঁজ হয়ে গেল। তখন আমিই কেষ্টকে বলেছিলুম, কুমুদকে নিয়ে আপনার সঙ্গে শিগগির দেখা করো। দেখা করেনি ওরা?

—আজ সকালে ওঁরা এসেছিলেন।

কুমারবাহাদুর হেসে উঠলেন,—তাই কি আপনি আমার কাছে কোনও ক্লু খুঁজতে এসেছেন?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—যদি তা-ই ভাবেন, তাহলে আপনার ধারণা কী বলুন।

—কুমুদের ছেলের ব্যাপারে?

—হ্যাঁ।

কুমারবাহাদুর একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমাদের বাড়িটা সরকারকে কলেজ করতে দিয়েছিলুম। এতদিন সেখানে কলেজ হয়েছে। ওই বাড়িতে আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল। কুমুদ যখন বেকার, ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলুম। লাইব্রেরি আমার ঠাকুর্দার আমলের। বইপত্র অগোছাল অবস্থায় ছিল। বহু দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাকে সব বইয়ের ক্যাটালগ তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলুম। সেই সময় আমার পূর্বপুরুষের লেখা একটা সংস্কৃত কুলকারিকার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওতে আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য ছিল।

—সেটা কি ছাপানো বই ছিল?

—না। তখনও এ দেশে ছাপাখানার চল হয়নি। হাতে তৈরি পুরু কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি।

আমি বলে উঠলুম,—ওতে কি আপনার পূর্বপুরুষের কোনও গুপ্তধনের কথা—

আমার কথার ওপর কুমারবাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন,—না জয়ন্তবাবু! গুপ্তধন-টন থাকলে তা আমার ঠাকুর্দার আমলেই খুঁজে বের করা হত। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তিনি ব্যবসাবাণিজ্য করে কেষ্ট অধিকারীর মতো কোটিপতি হতেন। এই যে বাড়িটা দেখছেন, এটা ছাড়া আমার একটুকরো স্থাবর সম্পত্তি নেই। কোনোমতে ঠাটঠমক বজায় রেখেছি। তা-ও কতদিন পারব জানি না। হয়তো এই বাড়িটা কোনো প্রোমোটারকে বেচে একটা ফ্ল্যাটের খাঁচায় বাস করতে হবে।

কর্নেল বললেন,—সংস্কৃতে লেখা সেই পাণ্ডুলিপি কি আপনি পড়েছিলেন?

—নাঃ। আমার অত সংস্কৃতবিদ্যা ছিল না। বাবারও ছিল না। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল ওটা কোনও সংস্কৃতজানা পণ্ডিতকে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ

করিয়ে ছাপতে দেব। আমার পূর্বপূরুষের পারিবারিক ইতিহাস দেশের ঐতিহাসিকদের কাজে লাগতে পারত।

—তা হলে কি আপনার ধারণা, কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নিখোঁজ হওয়ার পিছনে সেই পাণ্ডুলিপির সম্পর্ক আছে?

কুমারবাহাদুর গম্ভীর মুখে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী আমাকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল। সে বলছিল,—কুমুদ ভটচার্য সংস্কৃত জানে। স্কুলে সে সংস্কৃত পড়াত। কাজেই কেষ্টর ধারণা সত্য হতেই পারে। আমি কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলুম কেষ্টকে। আশ্চর্য! আজ কেষ্ট আর কুমুদ আপনার কাছে এসেছিল। অথচ আমার কাছে কেষ্ট ওকে নিয়ে এল না। ব্যাপারটা গোলমেলে। আপনি যখন এই কেসে হাত দিয়েছেন, তখন আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, রায়গড়ে গিয়ে কুমুদকে সরাসরি চার্জ করুন। ছেলে কেন নিখোঁজ হল, তার আসল সূত্র কুমুদের কাছেই পাবেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—মিঃ অধিকারী আপনাকে কতটুকু বলেছে জানি না। তিনি কি উড়ো চিঠিতে বত্রিশের ধাঁধার কথাটা বলেছেন?

—বলেছে। কেষ্ট অধিকারী মহা ধূর্ত লোক। আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিল। আমি তাকে বলেছিলুম, কোনও ধাঁধাসম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমাদের পরিবারে এমন কোনও গুজবের কথাও চালু ছিল না।

কর্নেল হাসলেন,—আমার ধারণা, আপনি কিছু জানেন।

কুমারবাহাদুর আস্তে বললেন,—ব্যাপারটা গুপ্তধন-টন নয়। পাণ্ডুলিপিতে নাগরী লিপিতে লেখা একটা ছক দেখেছিলুম, তা সত্য। আমার মতে, ওটা তন্ত্রসাধনার কোনও গোপন সূত্র।

—ছকটা আপনি টুকে রাখেননি?

—নাঃ।

আপনার এটুকু সূত্রই আমার কাছে মূল্যবান। এবার আমরা উঠি। —বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

কুমারবাহাদুর একটু হেসে বললেন,—এর বদলে আমিও কিছু প্রত্যাশা করি কর্নেলসায়েব!

—বলুন।

—সেই হারানো পাণ্ডুলিপি আপনি আমাকে উদ্ধার করে দিন।

—কুমারবাহাদুর! আমার প্রথম লক্ষ্য সেই পাণ্ডুলিপি। কারণ ওটা না খুঁজে পেলে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের কিনারা করা আমার পক্ষে কঠিনই হবে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে পৌনে সাতটা বেজে


সমীর সরকার

গিয়েছিল। কর্নেল ষষ্ঠীকে কফি করতে বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর টুপি খুলে রেখে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—রায়গড় যাচ্ছেন কবে?

কর্নেল আস্তে বললেন,—আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি। তুমি কফি খেয়ে বাড়ি যাও। তারপর তৈরি হেয়ে এস। তোমার গাড়ি আমার খালি গ্যারাজঘরে রাখার অসুবিধে নেই। আমি হাওড়া স্টেশনে ফোন করে ট্রেনের খবর নি।

বলে তিনি রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন, —কে বলছেন?... সে কী কথা! আমার কর্তাবাবা তো বেঁচে নেই।... বলেন কী? টাক ফুটো করে দেবেন? আমার টাকের প্রতি কেন সুনজর ব্রাদার?... আচ্ছা। আচ্ছা।

কর্নেল রিসিভার রেখে তুম্বোমুখে বললেন,—কেউ হুমকি দিল। মনে হচ্ছে, সাপের লেজে পা দিয়েছি।

## ॥ চার ॥

শীতের রাতে ট্রেন জার্নির অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু এমন বিচ্ছিরি ট্রেন জার্নি এই প্রথম। ট্রেনটা যেন ঘুমোতে-ঘুমোতে এগোচ্ছিল। আর সে কী শীত! আসলে রায়গড় ছোট্ট স্টেশন। তাই সেখানে কোনও মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটা ফার্স্টক্লাসের বগি এবং নামেই তা ফার্স্টক্লাস। মনে হচ্ছিল অসংখ্য ছেঁদা দিয়ে শীত ঢুকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলছে।

কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ফার্স্টক্লাসে আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। যখনই কোথাও ট্রেন থামছিল, তখনই সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখছিলুম। ক্যুপের দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। কিন্তু সেই যে কর্নেলকে টেলিফোনে হুমকি দিয়েছিল এবং কর্নেল বলেছিলেন,—মনে হচ্ছে যেন সাপের লেজে পা দিয়েছি; তাই সারাক্ষণ চাপা একটা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছিল না।

তবে সারা পথ কেউ ক্যুপের দরজায় নক করেনি এবং আমি জ্যাকেটের ভেতরপকেটে আমার লাইসেন্সড রিভলভার তৈরি রেখে বাথরুমে যাওয়ার ছলে দেখে নিচ্ছিলুম, অন্য কোনও ক্যুপে কেউ উঠেছে কিনা। কেউ কোনও স্টেশনে এই ফার্স্টক্লাসে ওঠেনি। তবু অস্বস্তি কাটছিল না।

রায়গড়ে পৌঁছুনোর কথা ভোর পাঁচটা নাগাদ। পৌঁছুল সাড়ে সাতটায়। নিঝুম নিরিবিলি ছোট্ট স্টেশন। আমরা দুজন ছাড়া আরও কয়েকজন যাত্রী নেমে চায়ের স্টলে ভিড় করল। তারা সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। মাটির ভাঁড়ে ফুঁ দিতে

দিতে চা খেয়েই তারা নিচের চত্বরে নেমে গেল। তারপর দেখলুম, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের পেছনে উঠে গেল এবং ট্রাকটা গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে গাঢ় কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ট্রেনটা তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। এবার এখানে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নাও।

বললুম,—কষ্ট কী বলছেন? হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছে, এমন সাংঘাতিক শীত।

—আরও সাংঘাতিক শীত তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে জয়ন্ত। হাড়মটমটিয়া তার নাম।

চা-ওয়ালা খুব খাতির করে গরম কফির কাপ-প্লেট হাতে তুলে দিয়ে বলল,—স্যারদের কোথায় যাওয়া হবে?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—শুনলে না? হাড়মটমটিয়া বললুম।

চা-ওয়ালা কিন্তু হাসল না। সে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বললো,—স্যার! আপনারা কি হাড়মটমটিয়ার নতুন ফরেস্ট বাংলোয় যাবেন?

—হ্যাঁ।

সে চাপা স্বরে বললো,—সাবধানে থাকবেন স্যার।

—কেন বলো তো?

—গত রাতে নটার ট্রেনে আমার মাসতুতো ভাই যতীন কলকাতা গেল। তার মুখে শুনলুম, ফরেস্টবাংলোর পেছন দিকে কাল সন্ধ্যাবেলা হাড়মটমটিয়া আবার একটা মানুষ খেয়েছে!

—যতীন তো তা-ই বলে গেল। সে নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড! চৌকিদার হাড়মটমটিয়ার হাঁকডাক শুনতে পেয়েছিল। তারপর রায়গড়ে খবর দিয়েছিল। যে লোকটাকে খেয়েছে, সে নাকি রায়গড়ের লোক। ওখানে সন্ধ্যাবেলা কেন গিয়েছিল কে জানে!

—তোমার বাড়িও কি রায়গড়ে?

—না স্যার। পাশের গ্রামে হাতিপোঁতায়।

—হাড়মটমটিয়া আবার মানুষ খেয়েছে বললে। আগেও কি খেয়েছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়গড়ের এক মাস্টারমশাইয়ের ছেলেকে খেয়েছিল শুনেছি। তার মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু রক্তটক্ত পড়েছিল। যতীন বলে গেল, এবার লোকটার রক্তমাখা মড়া পাওয়া গেছে।

—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, কানুহরি দাস।

—আচ্ছা, এই যে হাড়মটমটিয়া বলছ, সেটা কি কোনও জন্তু?

কানুহরি চা-ওয়ালা আবার চাপা স্বরে বলল,—জন্তু-টন্তু নয় স্যার! কেউ বলে পিশাচ। কেউ বলে যখ। রায়রাজাদের গড় পাহারা দিত। সেখান থেকে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। পিশাচ বলুন, যখ বলুন, মানুষের রক্ত তাদের খাবার। শুধু রক্তই বা কেন? মাংসও খায় শুনেছি। কুমুদ মাস্টারমশাইয়ের ছেলেটাকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল না? কচি হাড়। তাই হাড়সুদ্ধু খেয়ে ফেলেছিল। বুঝলেন না?

বুঝলুম। —বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন।

এতক্ষণে কয়েকজন যাত্রী এসে চায়ের স্টলে ভিড় করল। কানুহরি তাদের একজনকে বললো,—নিমাই! শুনলুম, আবার নাকি হাড়মটমটিয়া তোমাদের গ্রামের কাকে খেয়েছে?

নিমাই বাঁকা মুখে বললো,—বজ্জাতি করতে গিয়েছিল। তেমনি ফলও পেয়েছে।

—বজ্জাতি মানে?

—বজ্জাতি না হলে জঙ্গলে গিয়ে যকের ধন খুঁড়ে বের করতে গিয়েছিল কেন উপেন? বাংলোর চৌকিদারের মুখে খবর পেয়ে অনেক লোক ছুটে গিয়েছিলুম। ঢাকঢোল কাঁসি বাজিয়ে মশাল জ্বেলে সে এক কাণ্ড! তারপর দেখি উপেন দত্ত একটা গর্তের পাশে পড়ে আছে। একটা শাবলও দেখতে পেলুম! রক্তারক্তি ব্যাপার।

—হাড়মটমটিয়ার ডাক শুনতে পাওনি?

—আমরা শুনতে পাইনি। চৌকিদার নাকি শুনেছিল। নিমাই বেঞ্চে বসে বাঁকা মুখে বলল,—ছেড়ে দাও! কথায় বলে না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মা কালীর দিব্যি কানুদা! উপেন ফি শনিবার কলকাতা থেকে এসে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত—তা জানো?

—বলো কী নিমাই?

নিমাই চায়ে চুমুক দিয়ে বললো,—নিজের চোখে দেখেছি। বাবুপাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে ফুটবল ক্রিকেট-ফিকেট সব খেলত। আমি বসে-বসে খেলা দেখতুম। আর শনিবার হলেই উপেন দত্ত সেখানে হাজির। এক ফাঁকে কখন জঙ্গলে ঢুকে যেত।

নিমাই এবং কানুহরির কথাবার্তা চলতে থাকল। কর্নেল হঠাৎ উঠে পড়লেন। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচের চত্বরে নেমে আস্তে বললেন, —কী বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম,—গেঁয়ো লোকদের কুসংস্কার। জনৈক উপেন দত্তকে কেউ বনবাংলোতে ডেকে পাঠিয়েছিল। তারপর মওকা বুঝে খুন করেছে। অবশ্য

এটাও একটা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড। আপনি নাক গলাচ্ছেন দেখলেও অবাক হব না।

কর্নেল হাঁটতে হাঁটতে বললেন,—গেঁয়ো লোকেদের কুসংস্কার বলছ। শহরের উচ্চশিক্ষিত এবং বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদেরও প্রচুর কুসংস্কার থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ হলে এর প্রমাণ পেতে।

—কিন্তু আমরা কি পায়ে হেঁটেই বনবাংলাতে যাব?

—বনবাংলো এখান থেকে শর্টকাটে মাত্র দু কিলোমিটার। লক্ষ্য করো, রুক্ষ মাটি ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁইয়ে ভরা ঢেউখেলানো মাঠটা আমাদের চলার পক্ষে খাসা! কারণ এখনও কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে চলাই ভালো। আমার ইচ্ছে ছিল, ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছুলে চুপিচুপি বনবাংলোয় পৌঁছানো যাবে। কিন্তু ট্রেনটা যাচ্ছেতাই দেরি করে পৌঁছুল।

ওঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেললে কেলেঙ্কারি!

কর্নেল হাসলেন,—যেদিকে সোজা হাঁটছি, সেদিকেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আশা করি দিনের বেলা হাড়মটমট করে বেড়ানো পিশাচ বা যখটা আমাদের দেখা দেবে না। সে তো নিশাচর!

কিছুদূর চলার পর রুক্ষ অনাবাদি মাঠটা ঢালু হয়ে নেমেছে দেখা গেল। তারপর একটা ছোট্ট শীর্ণ নদী। নদীতে একফালি জলস্রোত তিরতির করে বয়ে চলেছে। নদীর বুকে অজস্র পাথর ছড়িয়ে আছে। কর্নেলের নির্দেশে সাবধানে সেইসব পাথরে পা ফেলে ওপাশে পৌঁছুলুম। ততক্ষণে কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সোনালি রোদ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শিশিরে নিম্নাঙ্গ ভিজে করুণ দশা হল। তবে গায়ে পুরু জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি থাকায় শরীরের ঊর্ধ্বাংশ রক্ষা পেল।

এবার সামনে আবছা কালো বিশাল উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—এবার পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি?

কর্নেল বললেন,—ওটা পাহাড় নয়। ওটাই সেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল! এখান থেকে মাটিটা ক্রমশ উঁচু হয়েছে বলে কুয়াশার ভেতর জঙ্গলটা পাহাড় মনে হচ্ছে।

চড়াইয়ে উঠে গিয়ে একফালি মোরাম বিছানো রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে একটা টিবিতে উঠে গেছে। সেই টিবির ওপর হলুদ রঙের ছোট্ট বাংলো দেখতে পেলুম।

বাংলোর চৌকিদার আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। সে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বললো,—আপনি কি কর্নেলসাহেব? রেঞ্জারসায়েব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাংলোর বারান্দায় বসে রেঞ্জার সায়েব চা খাচ্ছিলেন। বারান্দার নিচে একটা জিপগাড়ি। কর্নেল এবং আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন,—আসুন! আসুন কর্নেলসায়েব! গতরাতে যখন আপনি টেলিফোন করলেন, তখন আমি সবে এই বাংলো থেকে বাড়ি ফিরেছি। ফোনে সব কথা বলতে পারিনি। তবে আপনি আসছেন শুনে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলুম। তারপর ভোরবেলায় উঠে এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।

কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেঞ্জারের নাম অমল চ্যাটার্জি। চৌকিদারকে তিনি শিগগির কফি আনতে বললেন। লক্ষ করলুম, ভদ্রলোক কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। উত্তেজনার কারণ আমার অবশ্য জানা। স্টেশনে শুনে এসেছি, রায়গড়ের জনৈক উপেন দত্তের রক্তাক্ত লাশ কাল সন্ধ্যায় এই বাংলোর পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর পাওয়া গিয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—আপনাকে বলেছিলুম, শিগগির আমরা এই জঙ্গলে একটা বাংলো বানাচ্ছি। এরপর এলে আপনি সেখানেই থাকবেন। আপনার মতো একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পক্ষে এটাই উপযুক্ত জায়গা। তো দেখুন, বাংলো হয়ে গেছে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

চৌকিদার ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন,—কাল সন্ধ্যায় কেন আপনাকে এখানে আসতে হয়েছিল, সে-সব কথা স্টেশনে শুনে এলুম।

শুনেছেন? —মিঃ চ্যাটার্জির চোখদুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ এ এক অদ্ভুত ঘটনা কর্নেলসাহেব! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে কোনও হিংস্র জন্তু নিশ্চয় আছে। কিন্তু আমার একার কেন, রায়গড়ের সবারই সন্দেহ, উপেন দত্ত ওখানে সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় লুকিয়ে রাখা কোনও দামি জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল।

—পুলিশ এসেছিল নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। পুলিশ বডি তুলে নিয়ে গেছে। রায়গড় হাসপাতালে বডির পোস্টমর্টেম হবে। তবে আপাতদৃষ্টে পুলিশের ধারণা আমার সঙ্গে মিলে গেছে।

—কোনও হিংস্র জন্তুর হামলা?

—ঠিক তা-ই। রায়গড়ের বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস এ কাজ হাড়মটমটিয়ার!

রেঞ্জার সায়েব কথাটা বলে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আর সব লোকের কী ধারণা?

—উপেন দত্ত লোকটার নামে অনেক বদনাম ছিল। এলাকার চোর-

ডাকাতদের কাছে চোরাই মাল কিনে কলকাতায় ব্যবসা করত। কাজেই পাওনা-কড়ি নিয়ে কোনও চোর বা ডাকাতের সঙ্গে বিবাদ ছিল। সে উপেনকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছে।

—আপনি তো লাস দেখেছেন। কী অবস্থায় ছিল?

—গর্তের পাশে কাত হয়ে পড়ে ছিল। সোয়েটার ছিঁড়ে ফালাফালা। সারা শরীরে ধারাল নখের আঁচড় কাটা। মাথার খুলির অবস্থাও তাই।

—শুনলুম, চৌকিদারই প্রথমে লাস দেখতে পেয়েছিল?

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—নাখুলাল! তুমিই বলো সায়েবকে।

চৌকিদার নাখুলাল বললো,—সার! এই বাংলোর পেছনে একটা কেমন আওয়াজ হয়েছিল। আমি বল্লম আর টর্চ নিয়ে গেলুম। ভাবলুম, চোরচোট্টা—নয়তো শেয়াল। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ স্যার! পেছনের পাঁচিল পর্যন্ত সাবধানে এগিয়ে গেলুম। তারপর নিচের জঙ্গলের ভেতর আলো ফেললুম! তখনই দেখলুম, একটা লোক ঝোপে ঢুকে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, কে ওখানে? কোনও সাড়া এল না। আর তারপরই হাড়মটমটিয়ার চেরাগলার গজরানি ভেসে এল।

কর্নেল বললেন,—তুমি কি আগে কখনও তার গজরানি শুনেছ?

—হ্যাঁ সার! এই বাংলো হওয়ার পর রাত্তিরে তিন-তিনবার শুনেছি। প্রথমে শনশন করে হাওয়ার মতো শব্দ ওঠে। তারপর মট্ মট্ মট্ মট্—তারপর কানে তালাধরানো আওয়াজ। আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ! এই রকম।

—তো তারপর তুমি কী করলে?

—এখানে থাকার সাহস হল না আর। ঘুরপথে মাঠ দিয়ে আমাদের বস্তিতে চলে গেলুম।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—কর্নেলসায়েব তো নাখুলালদের বস্তি দেখেছেন!

কর্নেল বললেন,—আদিবাসীদের বস্তি?

—হ্যাঁ নাখুলালরা সবাই খ্রিস্টান। তা-ও আপনি জানেন!

—জানি। তো নাখুলাল! তারপর কী করলে বলো!

নাখুলাল শ্বাস ছেড়ে বললো,—বস্তির লোকেরা আমাকে রায়গড়ে খবর দিতে পাঠাল। খুলেই বলছি স্যার! হাড়মটমটিয়া আমাদের দেবতা। আমাদের লোকেরা বলে 'ঠাকুরবাবা'। ওঁকে আমরা ভক্তি করি। কিন্তু জঙ্গলে আমি একটা লোক দেখেছি। ঠাকুরবাবা তাকে খেয়ে ফেলেছেন। আমাদের তখন একটাই কাজ। রায়গড়ে খবর দেওয়া। কেন? না—আর যেন অন্য জাতের কেউ ঠাকুরবাবাকে চটায় না।

—তুমি খবর দিলে কাকে?

—আজ্ঞে সার কেষ্টবাবুকে। উনি এখন রায়গড়ের লিডার। সদ্য উনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন শুনলুম। কিন্তু খবর পেয়েই গাঁসুদ্ধু লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। তারপর—

মিঃ চ্যাটার্জি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এখন সরকারি নিয়ম করা হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের খবর না দিয়ে এই জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। তাই আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, আমাকে একা আসতে হল বন্দুক নিয়ে। এখনও ফরেস্ট গার্ড বহাল করা হয়নি।

—লাস শনাক্ত করার পর কি পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! লাগেজ ঘরে রেখে এখনই একবার ওখানে যেতে চাই।

—অবশ্যই। নাখুলাল! সায়েবদের ঘর খুলে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বাংলোর পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলুম। নাখুলাল বাংলোয় থাকল। মিঃ চ্যাটার্জি তাকে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বললেন।

ঢালু মাটিতে পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। ঝাপঝাড় আর উঁচু-উঁচু গাছের তলায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। অমল চ্যাটার্জির কাঁধে বন্দুক। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটু পরে মোটামুটি সমতল মাটি পাওয়া গেল। এখানে জঙ্গলের কিছুটা অংশ ফাঁকা। ফাঁকা রুক্ষ মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়া আছে দেখতে পেলুম। গর্তের পাশে কালচে ছোপগুলো যে উপেন দত্তেরই রক্ত, তা বুঝতে পারলুম।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে গর্তের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। মাত্র হাতখানেক গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই গর্তের দিকে তিনি তাকিয়ে যেন ধ্যানমগ্ন হলেন।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন,—শক্ত চাঙড় মাটি, তা না হলে জন্তুটার পায়ের ছাপ পড়ত।

বললুম—আশ্চর্য! জঙ্গলের এই জায়গাটুকু এমন রুক্ষ কেন? একটু ঘাস পর্যন্ত গজায়নি।

—আমার ধারণা, এর তলায় গ্রানাইট পাথর আছে। এই অঞ্চলে এমন রুক্ষ নীরস মাটি অনেক জায়গায় দেখেছি। ঘাসও গজাতে পারে না।

—কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি, উপেনবাবু যদি কোনও চোরাই মাল পুঁতে রাখতে চাইতেন, তা হলে এমন জায়গা বেছে নিলেন কেন?

—সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আবার এমন যদি হয়, উপেনবাবু কোনো

চোরাই মাল এখানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং কাল সন্ধ্যায় তা তুলে নিতে এসেছিলেন—তা হলে সেই চোরাই মালটাই বা গেল কোথায়? কাল সন্ধ্যায় অত আলো এবং মানুষজনের ভিড় ছিল এখানে। কারও-না-কারও চোখে পড়তই জিনিসটা। কী বলেন?

—এমন হতে পারে আক্রান্ত হওয়ার সময় দূরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন!

রেঞ্জার সায়েব হাসলেন,—আমি ভোরবেলা এসে এখানে চারদিকে জঙ্গলের ভেতর খুঁজেছি। কুয়াশা ছিল। কিন্তু ওটা বাধা নয়। তেমন কোনও জিনিস খুঁজে পাইনি।

এইসময় কর্নেল গর্তের চারপাশের মাটি থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! আপনার অনুমান ঠিক। এই দেখুন, কালো রঙের অজস্র লোম পড়ে ছিল এখানে।

মিঃ চ্যাটার্জি তাঁর হাত থেকে কয়েকটা কালো লোম নিয়েই বললেন,—ভালুকের লোম! এই জঙ্গলে ভালুক থাকার গুজব শুনেছিলাম। তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বুনো ভালুক খুব হিংস্র। মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। হ্যাঁ—ওই রকম ক্ষতচিহ্ন একমাত্র ভালুকের নখের আঁচড়েই হতে পারে।

কর্নেল বললেন,—ঠিক বলেছেন। এবার চলুন। বাংলোতে ফেরা যাক।

অমল চ্যাটার্জি হাত থেকে লোমগুলো ঝেড়ে ফেলে বললেন,—আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন কর্নেল সায়েব। বিশেষ করে আপনাকেই বলছি কথাটা। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি অর্কিড কিংবা পরগাছার নেশায় আপনার দেখেছি জ্ঞানগম্যি থাকে না।

তিনি কথাটা বলে হেসে উঠলেন। তারপর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকলেন। এই সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্টেশনে শোনা সেই নিমাইয়ের কথা। রায়গড়ের উপেন দত্ত প্রতি শনিবার কলকাতা থেকে এসে এই জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন। গতকাল অবশ্য রবিবার ছিল। শনিবারে জঙ্গলে ঢুকলে যে উপেন দত্ত রবিবার আবার ঢুকবেন না, তার মানে নেই। দেখা যাচ্ছে, রবিবারেও ঢুকেছিলেন এবং বেঘোরে ভালুকের আক্রমণে মারা পড়েছেন।

কর্নেলের পাশে গিয়ে চাপা স্বরে বললুম,—কর্নেল! এই উপেন দত্ত সেই পীতাম্বর রায় নয় তো?

কর্নেল মৃদু হেসে গলার ভেতর বললেন,—তুমি সবই বোঝো জয়ন্ত! তবে একটু দেরিতে। হ্যাঁ—উপেন দত্তই যে পীতাম্বর রায়, তাতে কোনো ভুল নেই। তবে কথাটা চেপে যাও।

আমরা বাংলোর নিচে পৌঁছেছি, হঠাৎ ওপরে বাংলোর পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে নাখুলাল চিৎকার করে উঠল,—সায়েব! ভালুক! ভালুক!

রেঞ্জার সায়েব চমকে পিছনে ঘুরে গুডুম করে বন্দুক ছুঁড়লেন। জঙ্গলে পাখিদের চ্যাঁচামেচি এবং যেন একটা হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। কর্নেল তখনই বাইনোকুলারে পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর ভালুক খুঁজতে থাকলেন।

রেঞ্জারসায়েব অমল চ্যাটার্জি বন্দুক বাগিয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব! ভালুকটা কি দেখতে পেলেন?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন,—কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছি। জন্তুটা দেখতে ভালুকের মতো। কিন্তু চলাফেরা ভালুকের মতো নয়।

মিঃ চ্যাটার্জি উত্তেজিত ভাবে বললেন,—তা হলে কি ওটা শিম্পাঞ্জি?

কর্নেল হাসলেন,—এদেশের জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি থাকে না মিঃ চ্যাটার্জি! আপনি তা ভালোই জানেন।

—না। মানে, আমি বলতে চাইছি, এলাকায় শীতের সময় মেলা বসে। সার্কাসের দলও আসে। দৈবাৎ কোনও সার্কাসের শিম্পাঞ্জি পালিয়ে এসে এই জঙ্গলে ঢুকতেও পারে।

—ওটা শিম্পাঞ্জিও নয়।

—তা হলে ওটা কী?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া। সম্ভবত সে চুপিচুপি আমাদের কথা শুনতে আর আমরা কী করছি, তা দেখতে এসেছিল।

রেঞ্জারসায়েব হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

## ॥ পাঁচ ॥

ফরেস্ট রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জি আমাদের ব্রেকফাস্টের পর চলে গেলেন। বলে গেলেন,—রায়গড় ব্লক ডেভোলাপমেন্ট অফিসের একটা কোয়ার্টারে তিনি আপাতত থাকার এবং অফিস করার জায়গা পেয়েছেন। পরে এই বাংলোর পাশে তাঁর অফিস এবং কোয়ার্টার হবে। যাই হোক, দরকার হলে চৌকিদারকে পাঠালে তিনি চলে আসবেন। তাছাড়া সময় হাতে থাকলে তিনি কর্নেলকে সঙ্গ দেবেন। বিশেষ করে এই জঙ্গলে যে অদ্ভুত প্রাণীটা এসে জুটেছে, তার সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর যথেষ্ট। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে প্রাণীটাকে প্রাণে মারা যাবে না।

ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে চুরুট টানতে টানতে কর্নেল বললেন, —আচ্ছা নাখুলাল! তোমার খ্রিস্টান নাম কী?

চৌকিদার সবিনয়ে বললো,—যোশেফ নাখুলাল সার!

—তোমাদের ফাদার স্যামুয়েল কি এখন বস্তিতে স্কুল চালাচ্ছেন?

না সার! ফাদার স্কুলের ভার দিয়েছেন আমার ভাইপো ফিলিপকে।

ফিলিপ সুরেন ওর নাম। দুমকা মিশন স্কুল থেকে পাস করে এসেছে। — বলে চৌকিদার কণ্ঠস্বর চাপা করল : সুরেন মাস্টারমশাইয়ের ছেলে দীপুর বন্ধু ছিল সার! দীপু যেদিন জঙ্গলে হারিয়ে যায়, সুরেনই তো সাহস করে বাবুদের ছেলেদের ডেকে তাকে খুঁজতে ঢুকেছিল।

—আচ্ছা নাখুলাল, ওদের যে ফুটবলটা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি খুঁজে পেয়েছিল ওরা?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে ভয়পাওয়া মুখে বললো,—সেদিন বলটার দিকে কারও মন ছিল না। পরদিন সকালে সুরেন বলটা দেখতে পেয়েছিল। বলটা কোনও জানোয়ার ছিঁড়ে ফালাফালা করে রেখেছিল। ব্লাডারও ছিঁড়ে ফেলেছিল। সুরেনকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন।

—করব। তোমাদের বস্তিটার কী নাম যেন?

—রংলিডিহি। আপনি দেখে থাকবেন, বস্তির মাটির রঙ একেবারে লাল। বুড়োদের কাছে শুনেছি, রংলিডিহিও জঙ্গলের মধ্যে ছিল। আর এই জঙ্গল ছিল একেবারে রেললাইন পর্যন্ত। এখন ওদিকটা ফাঁকা।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নাখুলাল! তুমি আমাদের খাওয়ার জন্য বাজার করে আনো। বাজার তো সেই রায়গড়ে। তুমি কি পায়ে হেঁটে যাবে?

—না সার! সাইকেল আছে। বাংলোর পিছনে আমার থাকার ঘর। সেখানে আছে। আপনারা আসবেন শুনে আমি সাইকেল এনে রেখেছি।

কর্নেলের কাছে টাকা নিয়ে যোশেফ নাখুলাল সাইকেলে থলে ঝুলিয়ে ঢালু রাস্তায় নেমে গেল এবং একটু পরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল।

বাংলোটা উঁচুতে বলে শীতের হাওয়া এসে হুলুস্থুল বাধাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে পড়লুম। নতুন তৈরি ঘরে পেন্ট আর চুনকামের গন্ধ পাচ্ছিলুম। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। চোখে পড়ল ঢেউখেলানো অনাবাদি, কোথাও আবাদি প্রান্তর। তার শেষে নীল পাহাড়ের উঁচু-নিচু শিখর। বুঝলুম, ওদিকটা বিহার এবং ওই পাহাড় ছোটনাগপুর রেঞ্জের একটা অংশ।

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—রায়গড়-রাজাদের পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে পশ্চিম-উত্তর কোণে তাকাও। যে নদীটা পেরিয়ে এলুম, ওখানে তা জলে ভরা। কারণ দুর্গের নিচে দহ ছিল একসময়। এখন দহ বুজে গেছে। তবে জলের স্রোত সাংঘাতিক তীব্র।

বললুম,—এখনও কুয়াশা আছে। আপনার বাইনোকুলারটা দিন।

বাইনোকুলার অ্যাডজাস্ট করে নিতেই চোখে পড়ল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে এবং একটা অংশ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে আছে।

হঠাৎ দেখলুম, ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু কর্নেলের বাইনোকুলারে তাদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। একজনের পরনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট ও মাথায় টুপি। তার কাঁধে একটা কিটব্যাগ ঝুলছে। অন্যজন বেঁটে এবং মোটাসোটা। তার পরনে প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার আর মাথায় মাফলার জড়ানো। দুজনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তারা অঙ্গভঙ্গি করে সম্ভবত কথা বলছে।

কর্নেলকে বললুম কথাটা। অমনি তিনি বাইনোকুলার প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন,—কী আশ্চর্য! পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ওখানে কী করছেন?

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—দুজনেই জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। যাক্ গে। এখন এ নিয়ে মাথাব্যথার মানে হয় না। ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে তুমি গড়িয়ে নাও। নাখুলাল ফিরে এলে স্নান করে ফ্রেশ হওয়া যাবে।

নাখুলাল ফিরল ঘণ্টাদেড়েক পরে। সে বললো,—সুরেনকে আসতে বলেছি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তুমি আমাকে আরেক পেয়ালা কফি খাইয়ে দাও।

নাখুলাল হাসল,—জানি সার! রেঞ্জারসায়েব বলেছেন, আপনি হরঘড়ি কফি খান।

—এখানে স্নানের জলের ব্যবস্থা আছে তো?

—আছে সার! বাংলোর পিছনে নিচে একটা কুয়ো আছে। কুয়োর মুখ ঢাকা। ওই দেখুন, টিউবেল। টিউবেলের নল কুয়োর মধ্যে ঢোকানো আছে। আমি জল তুলে দেব। এক বালতি জল গরম করে দেব।

বলে সে বাংলোর পিছন দিকে কিচেনে চলে গেল। তারপর দশমিনিটের মধ্যেই একপট কফি এনে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্নেলের কথায় কফি পান করতে হল। কর্নেলের বরাবর ওই এক কথা ঃ কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।

কফি খেয়ে আমি পোশাক বদলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাংলোর পিছনে গেলেন। ভাবলুম, হাড়মটমটিয়া নামক অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে বাইনোকুলারে আবার খুঁজতে গেলেন। চৌকিদার প্রাণীটাকে দেখে ভালুক ভেবেছিল। কিন্তু আমি প্রাণীটাকে না দেখতে পেলেও কোনও হাড়মটমটকরা শব্দ শুনিনি। এদিকে কর্নেল গম্ভীর মুখে বলছিলেন, প্রাণীটা ভালুকের মতো দেখতে হলেও ভালুক নয় এবং ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া! সে নাকি ওত পেতে আমাদের কথা শুনতে এসেছিল! কী অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার!

এই দিনদুপুরে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গা ছমছম করে উঠল! ঘুমের

রেশ ছিঁড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর বিখ্যাত ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে দুর্গের ধ্বংসস্তূপে দেখার কথাও মনে পড়ল। ওঁদের আচরণও অদ্ভুত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে বারান্দায় বসলেন। বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বারান্দায় আমাকে দেখে কর্নেল বললেন,—ভেবেছিলুম তুমি কম্বল ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছ!

বেতের চেয়ার টেনে বসে বললুম,—স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোব। কিন্তু আপনি কি হাড়মটমটিয়ার খোঁজে বাংলোর পিছনে ওত পেতেছিলেন?

—না। নাখুলালের সঙ্গে গল্প করছিলুম। লোকটি খুব সরল প্রকৃতির। আদিবাসীদের এই গুণটা আছে। খ্রিস্টান হলেও রংলিডিহির বুড়ো-বুড়িরা যেমন, তেমনি যুবক-যুবতীরাও জঙ্গলের দেবতাকে মানে। শুনলে না? তখন নাখুলাল ঠাকুরবাবার কথা বলছিল। তবে এই ঠাকুরবাবা এক ভয়ঙ্কর দেবতা। আগে মানুষের রক্ত খেত। এখন মুর্গির রক্ত পেলেই খুশি হয়। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে একটা ডোবা আছে, ওটার পাড়ে ঠাকুরবাবার থান ছিল। এখন থানটা বটগাছের শেকড়ে ঢাকা পড়েছে। তবে নাখুলালের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেলুম। দীপুর হারিয়ে যাবার রাত্রে ডোবার পাড়ে রক্ত দেখে পুলিশ বলেছিল, আদিবাসীরা মুর্গি বলি দিয়েছিল, সেই রক্ত। নাখুলাল বলল, পুলিশের কথা ঠিক। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে কেউ কেউ ঠাকুরবাবার কাছে মুর্গি বলি দিয়ে মানত করে। মানত করার জন্য গোপনে বিকেলের দিকে বলির জায়গাটা পরিষ্কার করতে হয়। তো নাখুলাল কথায় কথায় বলে ফেলল, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মানত দিয়েছিল তার জ্যাঠতুতো দাদা মানকু। মানকুর সঙ্গে বিকেলে গোপনে থান পরিষ্কার করতে গিয়েছিল শিবু। শিবু খ্রিস্টান হলেও ওঝার পেশা ছাড়েনি। সে মন্তরতন্তর জানে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। জিজ্ঞেস করলুম,—তারপর?

কর্নেল আস্তে বললেন,—মানকু আর শিবু ওঝা দুটো লোককে একটা ঝোপের আড়ালে বসে থাকতে দেখেছিল। তাদের সাড়া পেয়ে ওরা লুকিয়ে পড়ে। ওদের একজনকে মানকু আর শিবু চিনতে পেরেছিল। সেই লোকটা রায়গড়ের উপেন দত্ত। অন্যজনকে চিনতে পারেনি।

—এসব কথা কি ওরা পুলিশ বা কুমুদবাবুকে বলেছিল?

—না। ওরা খামোকা ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। তাছাড়া ওদের মানত করার কথা শুনলে ফাদার স্যামুয়েল চটে যেতেন। মিশন থেকে সাহায্য বন্ধ হয়ে যেত। তাই নাখুলাল আমাকে অনুরোধ করল, এ সব কথা যেন কাকেও না বলি।

কথাগুলো শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। বললুম,—কর্নেল! তা বলে উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায় আর তার সেই গুণ্ডা গোবিন্দ বল কুড়োতে আসা দীপুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দীপু কোনো সুযোগে পালিয়ে যায়। তাই পীতাম্বর রায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

কর্নেল হাসলেন,—অঙ্কটা একটু জটিল জয়ন্ত!

—কেন?

কর্নেল বললেন,—পরে বুঝবে। আপাতত স্নান করে ফেলো। প্রায় বারোটা বাজে।

স্নানাহারের পর কর্নেল বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিলেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিতে গায়ে কম্বল চাপা দিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

সেই ঘুম ভাঙল চৌকিদারের ডাকে। সে চা এনেছিল। বিছানা ছেড়ে ঘড়ি দেখলুম। চারটে বেজে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

চৌকিদার বললো,—সুরেন এসেছিল সার! কর্নেলসায়েব তার সঙ্গে আমাদের বস্তিতে গেছেন।

কর্নেলের খেয়ালিপনা আমার জানা! রাগ করার মানে হয় না। বারান্দা থেকে লনে গিয়ে দিনশেষের বিবর্ণ রোদে দাঁড়িয়ে চা পানে মন দিলুম। লনের দুধারে সুদৃশ্য স্কুলবাগান। ঝাউগাছ, অর্কিড আর কয়েকরকম পাতাবাহার। এতক্ষণে দেখলুম একজন মালী এসে আপনমনে বাগান পরিচর্যা করছে। চৌকিদার তার সঙ্গে গল্প করতে গেল।

প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রেললাইন পূর্ব থেকে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে ঘুরেছে। ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে একটা মালগাড়ি। রেললাইন পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তা এই বাংলোর পূর্বদিকে আদিবাসী বস্তির কিনারা ঘেঁসে উত্তরে অদৃশ্য হয়েছে। ওটাই বোধহয় রায়গড়গামী সড়ক। এই অবেলায় পিচের সড়কে মাঝেমাঝে একটা করে ট্রাক বা বাস যাতায়াত করছে। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারও আসতে দেখলুম। গাড়িটা আদিবাসী বস্তির পূর্বে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালী কাজ শেষ করে চলে যাবার সময় আমাকে সেলাম ঠুকে গেল। সরকারি অফিসার ভেবেছে হয়তো। চৌকিদার বাংলোর পিছনের ঘর থেকে একটা চীনা লণ্ঠন জ্বেলে আমাদের ঘরে রাখল। তারপর একটা হেরিকেন বারান্দায় টেবিলে রাখল।

বললুম,—নাখুলাল? তুমি পেছনের ঘরে থাকো। তোমার ভয় করে না?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে বললো,—না সার! আমার বল্লম আর তীর-

ধনুক আছে। তবে সার! জঙ্গলে আছেন বাবাঠাকুর আর আমার বুকে ক্রশ আছে। প্রভু যিশু আছেন মাথার ওপর। ওই দেখুন! প্রভুর দয়া! চাঁদ উঠেছে।

এই বনভূমিতে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করব কী, আমার মনে শুধু সেই অদ্ভুতুড়ে জন্তুটার জন্য আতঙ্ক। হাওয়ায় গাছপালার অদ্ভুত শব্দে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম। হাতে ততক্ষণে টর্চ নিয়েছি এবং আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা ঘরে বালিশের পাশে রেখেছি।

বারান্দায় বসে অকারণ এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোয় জ্যোৎস্নাকে ক্ষতবিক্ষত করছিলুম। কতক্ষণ পরে কাঠের গেট খুলে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলুম। তিনি কাকে বললেন,—এবার তুমি চলে যাও। খামোকা কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসার দরকার ছিল না।

কেউ বললো,—তা কি হয় সার? আপনি বাংলোয় না পৌঁছানো পর্যন্ত মনে শান্তি পেতুম না।

কণ্ঠস্বর কোনও তরুণের মনে হল। উচ্চারণ বেশ মার্জিত। চৌকিদার বললো,—সুরেন এসেছিল সার?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে তোমার ভাইপো! খুব ভদ্র। সাহসীও বটে!

নাখুলাল বললো,—ফাদার বলেছেন ওকে কলেজে ভর্তি করে দেবেন।

—বাঃ! তবে আপাতত কফি নাখুলাল!

—হ্যাঁ সার! আমি জল চাপিয়ে রেখেছি কুকারে।

কর্নেল বারান্দায় উঠে ইজিচেয়ারটা টেনে বসলেন। বললেন,—জয়ন্ত! কথা বলছ না? তার মানে এই বৃদ্ধের প্রতি খাপ্পা হয়েছ। কিন্তু তোমার ভাতঘুম নষ্ট করার মানে হয় না। এতে তোমার শরীর ফিট হয়ে গেছে।

বললুম,—মোটেও খাপ্পা হইনি। লনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করছিলুম।

কর্নেল হাসলেন,—উপভোগ, নাকি হত্যা করছিলে? দূর থেকে বারবার টর্চের আলোর ঝলক দেখে আমি ভাবনায় পড়েছিলুম। হাড়মটমটিয়াকে ওত পাততে দেখেছ সম্ভবত।

বললুম,—ওকথা থাক। কতদূর ঘুরলেন বলুন!

নাখুলাল পটভর্তি কফি, দুধ, চিনি, এক প্লেট স্ন্যাক্স আর কাপপ্লেট রেখে গেল। কর্নেল কফি তৈরি করতে করতে বললেন,—তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তখন সুরেন এসেছিল। ছেলেটির বয়স ষোল-সতেরো বছর মাত্র। দারুণ সাহসী। জঙ্গলে যেখানে সে বলটা পরদিন কুড়িয়ে পেয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেল আমাকে। লক্ষ্য করলুম, খেলার মাঠ থেকে বলটা অতদূরে পৌঁছুতে পারে না।

তার মানে কেউ বলটা ইচ্ছে করেই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে দীপু বলটা দেখতে না পায়। যাই হোক, সুরেন আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি থেকে প্ল্যাস্টিক থলেতে ভরে ছেঁড়া বলটা এনে দেখাল।

—বলটা নিয়ে আসেননি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগটা দেখালেন। ওটা তাঁর পায়ের কাছে রাখা ছিল। বললেন,—পরে দেখবে। আপাতদৃষ্টে মনে হবে, কোনও হিংস্র জন্তু ওটাকে যথেষ্ট ছিঁড়েছে। কিন্তু আতস কাঁচের সাহায্যে দেখে বুঝলুম, সূক্ষ্ম সূচলো কোনও যন্ত্রে কেউ এই কাজটা করেছে। অর্থাৎ দীপু যেন কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে, এটাই তখন লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। বুঝতেই পারছ, দীপুকে যারা অপহরণ করেছিল, তারা তাকে নিরাপদে সম্ভবত কলকাতা নিয়ে যেতে সময় চেয়েছিল।

—কর্নেল! তা হলে আমার ধারণা ট্রেনে নয়, দীপুকে কিডন্যাপাররা মোটর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ঠিক ধরেছ। আমার থিয়োরি তা-ই।

—কিন্তু কুমুদবাবুর সঙ্গে দেখা করে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের পারিবারিক পাঠাগারের সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তার আগে আমাদের জানা দরকার, উপেন দত্ত জঙ্গলের ভেতর পাথুরে মাটিতে কেন গর্ত খুঁড়ছিল? জয়ন্ত! আজ রাত্রে আমরা ওখানে যাব। সুরেনকে বলেছি, সে রাত ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে এখানে চলে আসবে।

—নাখুলাল এসব কথা তাদের বস্তিতে রটিয়ে দেবে না তো?

—সুরেন তার জ্যাঠাকে সব বুঝিয়ে বলবে।

আধঘণ্টা পরে নাখুলাল মাথায় হনুমানটুপি এবং গায়ে ওভারকোট পরে কফির ট্রে নিতে এল। সে একটু হেসে বলল,—কর্নেলসায়েব! সুরেনকে কেমন লাগল আপনার?

কর্নেল বললেন,—খুব ভালো। সাহসী ছেলে। শোনো! সুরেন আবার এখানে রাত ন'টা নাগাদ আসবে।

নাখুলালের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। সে বলল,—অতো রাতে জঙ্গলের পথে সে একা আসবে? সার যদি বলেন, আমি গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

কর্নেল হাসলেন,—তোমার চিন্তার কারণ নেই নাখুলাল! ফাদার স্যামুয়েল সুরেনকে যে ক্রুশ দিয়েছেন, তাতে প্রভু যিশুর কথা খোদাই করা আছে। ওই ক্রুশ যার গলায় ঝুলছে, কারও সাধ্য নেই তার ক্ষতি করে।

আদিবাসী খ্রিস্টান যোশেফ নাখুলাল তাতে খুব আশ্বস্ত হলো বলে মনে হল না। গম্ভীর মুখে সে চলে গেল।

বাইরে ঠাণ্ডা বাড়ছিল। আমরা ঘরে গিয়ে বসলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্ল্যাস্টিকে মোড়া সেই ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার বের করে দেখালেন। বললুম,—কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।

কর্নেল বললেন,—কী?

—ছেঁড়া ফুটবলের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায়কে কি একই অস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে? তার শরীরে নাকি হিংস্র জন্তুর মতো নখের আঁচড় ছিল!

কর্নেল ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার কিটব্যাগে আগের মতো প্ল্যাস্টিকে মুড়ে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন,—সাধারণত এভাবে নখের আঁচড়ে কিছু ফালাফালা করা বুনো ভালুকের অভ্যাস। লোকেরা বা নাখুলাল নিজেও যে গর্জন শুনেছিল, বুনোভালুক কতকটা ওইরকম গর্জনই করে। হ্যাঁ—এ জঙ্গলে ভালুক থাকা অসম্ভব নয়। তাই দীপুর কিডন্যাপার ব্যাপারটা ভালুকের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তারপর তার ফটো এবং বত্রিশের ধাঁধার ব্যাপারটা এসে গিয়েছিল। কিন্তু লোকেরা তো এসব গোপন কথা জানে না! এরপর উপেন দত্তের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকেরা আগের মতো ভালুক বা ওই জাতীয় হিংস্র জন্তুকেই আততায়ী ভাবছে। আবার হাড়মটমটিয়ার কিংবদন্তিতে যারা বিশ্বাসী, তারা ভাবছে এটা ওই ভূতুড়ে প্রাণীর কাজ। এদিকে উপেন দত্ত চোরাই মালের কারবার করত। তা নিয়েও নানা কথা রটেছে। এ থেকে শুধু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়। তা হল : কেউ বা কারা একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়।

—কেন?

—এর উত্তর পাব, যদি উপেন দত্ত যা খুঁজছিল, তা দৈবাৎ আমরা পেয়ে যাই।

—রাত্রে কেন? দিনে সেই জিনিসটা খুঁজে বের করা যায় না?

—দিনে ঝুঁকি আছে। কারণ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে আমরা একত্র আবিষ্কার করেছি।

রাত ন'টায় সুরেন এল। সদ্য গোঁফের রেখা গজানো ছেলেটির মুখে লাবণ্য যেমন আছে, তেমনি স্মার্টনেসও আছে। আমাকে সে নমস্কার করে কর্নেলকে বললো,—কর্নেলসায়েব! আমি আমার জেঠুর সঙ্গে কথা বলে আসি।

আমরা সাড়ে ন'টায় খেয়ে নিলুম। নাখুলালের মুখ তখনও গম্ভীর। রাত

দশটায় আমরা বাংলোর উত্তরের গেট খুলে বেরিয়ে গেলুম। নাখুলাল বল্লম আর আচ্যাটারি টর্চ হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ সকালে যেখানে যেতে একটুও ভয় পাইনি, এই জ্যোৎস্নারাতে সেখানে পৌঁছুতে প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠছিলুম। আমার এক হাতে টর্চ, অন্যহাতে রিভলভার। কর্নেলের কাঁধে শুধু কিটব্যাগ। আর সুরেনের হাতে টর্চ আর একটা শাবল।

গাছের ছায়া দুলছে শীতের হাওয়ায়। জ্যোৎস্নায় চারপাশে অজানা রহস্য অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কারা যেন ছায়ার আড়ালে ওত পেতে আছে—তারা যেন মানুষ নয়। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কোথায় গাছের শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ হতে থাকল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম। কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করলেন।

শব্দটা মিনিট দুয়েক পরে থেমে গেল। সুরেন ফিসফিস করে বললো,—এই শব্দটা আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু কিসের শব্দ তা বুঝতে পারিনি।

কর্নেল আস্তে বললেন,—চলো! এসে গেছি।

সেই ফাঁকা জায়গায় গর্তটার কাছে পৌঁছে কর্নেল চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন,—উপেন দত্তের গর্ত থেকে হাত তিনেক দূরে—এই যে এখানে। টর্চ জ্বালবার দরকার নেই। এখানে দিনে একটা আবছা ক্রুশচিহ্ন দেখেছিলুম।

বলে উনি সেখানে বসে কিটব্যাগ থেকে কী একটা খুদে কালো জিনিস বের করলেন। জিনিসটাতে একবিন্দু লাল আলো ফুটে উঠল। এবার চিনতে পারলুম। ওটা কর্নেলের সেই মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র। যন্ত্রটা ক্ষীণ পিঁ পিঁ শব্দ করতে থাকল। কর্নেল স্যুইচ টিপলে শব্দ বন্ধ হল। আলোও নিভল। তিনি বললেন,—সাবধানে খোঁড়ো সুরেন!

আমি এবং কর্নেল একটু তাকাতে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। সুরেনের শাবল খুব সহজেই মাটিতে ঢুকে যাচ্ছিল। বুঝলুম, এখানে শক্ত মাটির বদলে বালি ভরা আছে। একটু পরে সুরেন শাবল রেখে দু'হাতে বালি সরিয়ে একটা ছোট্ট প্যাকেটের মতো জিনিস বের করল। কর্নেল সেটা তার হাত থেকে নিয়ে বললেন,—জায়গাটা আগের মতো ভরাট করে দাও। সকালে আমি এসে পাথর কুড়িয়ে এনে ঠিকঠাক করে দেব।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে চললুম। বাংলোর কাছাকাছি গেছি, হঠাৎ পিছনে একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

কর্নেল বললেন,—কুইক! দৌড়ে বাংলোয় গিয়ে ঢুকতে হবে।

## ॥ ছয় ॥

সামান্য চড়াই বেয়ে বাংলোর পিছনের গেটে পৌঁছে দেখি, নাখুলাল ওভারকোট পরে এক হাতে বল্লম এবং অন্য হাতে টর্চ নিয়ে সবে তার ঘর থেকে বেরুচ্ছে। সুরেন গেট বন্ধ করে আদিবাসী ভাষায় তার জেঠা নাখুলালকে কিছু বলল। তার কথার জবাবে নাখুলালও কিছু বললো। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তার মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করলুম।

পরে আমাদের ঘরে বসে চিনে লণ্ঠনের আলোয় সুরেনের মুখে চাপা হাসি দেখতে পেলুম। বললুম,—তোমার জেঠা নাখুলাল দূর থেকে অদ্ভুত গর্জন শুনে ভয়ে কোণঠাসা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ভয় পাওনি মনে হচ্ছে।

সুরেন বললো,—আমার জেঠুকে তখন জিজ্ঞেস করলুম, গেটে তোমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। তুমি ঘরে ঢুকে কী করছিলে? জেঠু বলল, হাড়মটমটিয়াকে সায়েবরা রাগিয়ে দিতে গেলেন। আমি গেটে একা দাঁড়িয়ে থাকলে সে আগে আমাকেই উপেন দত্তের মতো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। আসলে হয়েছে কী জানেন? ওই অদ্ভুত গজরানি শুনে জেঠু বেজায় ভয় পেয়েছে।

—কিন্তু তুমি ভয় পাওনি?

না সার! ওই গজরানি আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সাহস করে দাঁড়িয়ে দেখেছি, গজরানিটা হঠাৎ থেমে গেছে। হাড়মটমটিয়া আমাকে দেখা দেয়নি, মারতে আসা তো দূরের কথা। —বলে সুরেন হেসে উঠল ঃ কর্নেল সায়েবকে বলতে যাচ্ছিলুম, সাহস করে দাঁড়াব। দেখবেন, কেউ হামলা করবে না। তাছাড়া আপনার হাতে তো রিভলভার ছিল।

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন,—সুরেন! হাড়মটমটিয়া যে জিনিসটা এতদিন পাহারা দিচ্ছিল সেটা আজ রাতে আমরা হাতিয়ে নিয়েছি। তাই সে খাপ্পা হয়ে তেড়ে আসছিল। জয়ন্ত গুলি ছুড়লেও সে ভয় পেত না।

সুরেন একটু অবাক হয়ে বললো,—যে প্যাকেটটা খুঁড়ে তুললুম, ওতে কী আছে সার?

—পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তোমার বন্ধু দীপু নিখোঁজ হওয়ার পিছনে এই জিনিসটাই দায়ী। যাই হোক, তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরো না। তোমার জেঠার কাছে থাকো।

নাখুলাল বারান্দা থেকে আদিবাসী ভাষায় সুরেনকে কিছু বললো। সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপর দুজনে বারান্দা দিয়ে ঘুরে পিছনের দিকে চলে গেল।

কর্নেল দরজা বন্ধ করে দিয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে ছোট্ট প্যাকেটটা বের করলেন। সেটা শক্ত সুতোয় আগাগোড়া জড়ানো এবং বাঁধা ছিল। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে সুতো কেটে ফেললেন। তারপর কালো

পলিথিনের মোড়ক খুললে শক্ত কাগজের মোড়ক দেখা গেল। কর্নেল আস্তে বললেন,—জানি না, এতে যা আছে ভাবছি, তা সত্যিই আছে কি না। থাকলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে।

তারপর তিনি আরও একটা মোড়ক খুলে ফেললেন। কুচকুচে কালো, চৌকো, ইঞ্চি চারেক প্রস্থ এবং ইঞ্চি ছয়েক দৈর্ঘের এক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলুম। জিনিসটার উচ্চতাও প্রায় চার ইঞ্চি। সব দিকেই সুন্দর কারুকার্য করা। তবে ওটার একদিকে খুদে গোল বোতাম সারিবদ্ধভাবে বসানো আছে। কর্নেল বললেন,—বেশ ওজন আছে। হাতে নিয়ে দেখতে পারো!

হাতে নিয়ে অনুমান করলুম ওজন প্রায় হাফ কিলোগ্রাম হবে। আগাগোড়া উল্টেপাল্টে দেখার পর বললুম,—এটা পাথর মনে হলেও পাথরের নয় কর্নেল!

কর্নেল আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে বললেন,—না। এটা অজানা কোনও ধাতুতে তৈরি। জয়ন্ত! আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকে এই জিনিসটাই চুরি গিয়েছিল, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। পীতাম্বর রায় ওরফে উপেন দত্তই এটা চুরি করে জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল। কোনও কারণে গতরাতে সে এটা খুঁড়ে বের করতে এসেছিল। কিন্তু সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল জায়গা খুঁড়ছিল। সেই সময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ী। সম্ভবত সে উপেনের অজ্ঞাতসারে তাকে অনুসরণ করে এসেছিল!

বললুম,—কিন্তু আততায়ী যদি কোনও মানুষ হয়, তা হলে তাকে ওভাবে ক্ষতবিক্ষত করে মারল কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার এটুকু বোঝা উচিত জয়ন্ত। দীপুকে কোনও জন্তু মেরে ফেলেছে বলে গুজব রটেছিল। তা ছাড়া এই জঙ্গলে নাকি হাড়মটমটিয়া নামে সাংঘাতিক ভূত বা পেত্নি আছে বলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। কাজেই আততায়ী এবং তার পেছনে যারা আছে, তারা উপেন দত্তের মৃত্যু কোনও অদ্ভুত জন্তুর আক্রমণেই হয়েছে, এটা দেখাতে চেয়েছিল।

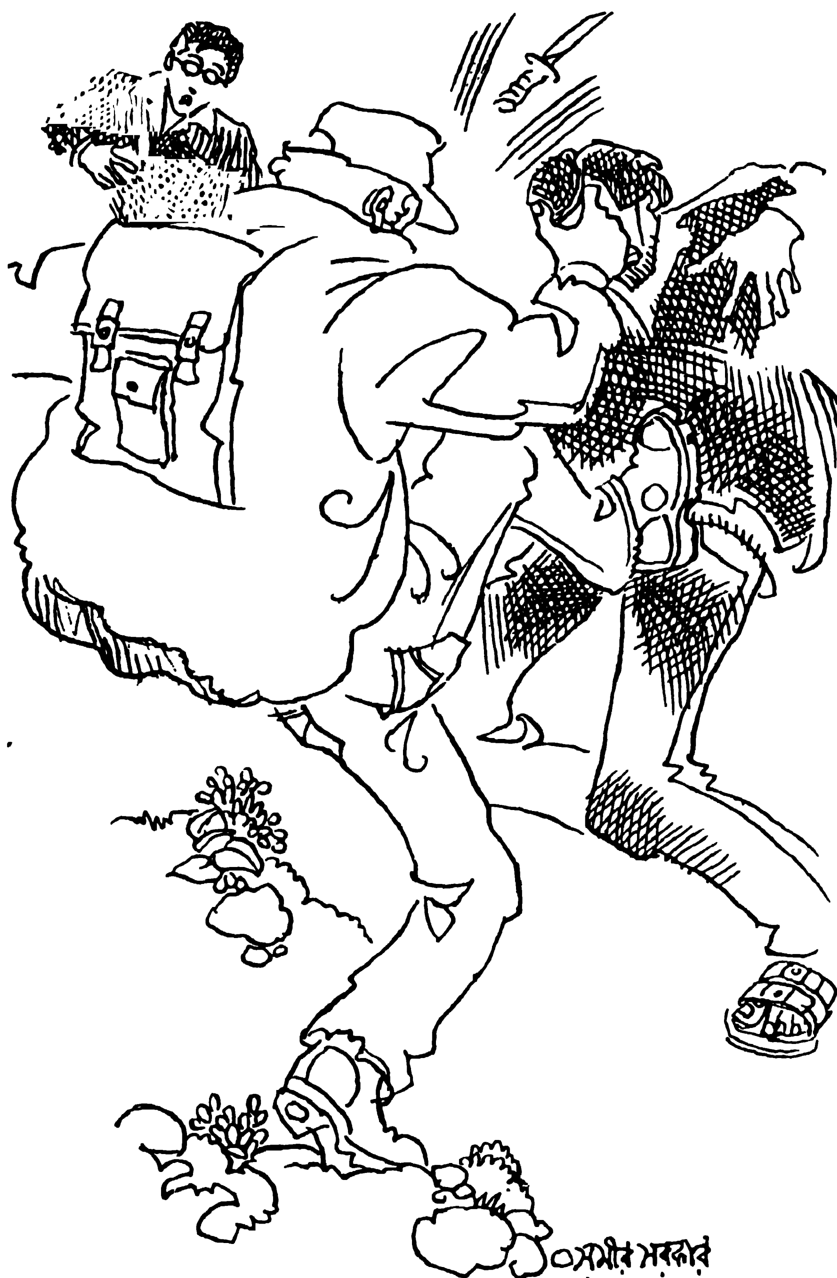
—কিন্তু ওই অমানুষিক গর্জন কি সত্যিই কোনও জন্তুর!

—জানি না।

—কর্নেল! আপনি আমাদের ছুটে পালিয়ে বাংলোয় আশ্রয় নিতে বলেছিলেন!

—হ্যাঁ। রাতবিরেতে জঙ্গলে শুধু রিভলভার দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় না। যাই হোক, এবার শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে আমরা কুমুদবাবুর বাড়ি যাব।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখি, নাখুলাল বেড-টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে


সমীর সরকার

আজ উজ্জ্বল রোদ ফুটেছে। কালকের মতো কুয়াশা নেই। জিজ্ঞেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

নাখুলাল বললো,—উনি ভোরে উঠে সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন।

—কোন্‌দিকে গেছেন দেখেছ?

নাখুলাল উত্তর-পশ্চিম কোণে দূরের দিকে আঙুল তুলে বললো,—পুরনো গড়ের খণ্ডহরের দিকে যেতে দেখেছি সার!

বেড-টি বিছানায় বসে আমার খাওয়ার অভ্যাস। কিন্তু বাইরে রোদ দেখে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। কুয়াশা আজ যেন দূরে সরে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পিচের সড়কে মাঝেমাঝে যানবাহন যাতায়াত করছে।

নাখুলাল বলে গেল, বাথরুমে গরম জল দিয়েছে। এখনই মুখ না ধুলে জলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাই বাথরুমে ঢুকলুম। তারপর প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বাংলোর পশ্চিমদিকে গেলুম। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপে কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অনুর্বর রুক্ষ মাঠ এবং নদীর দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল, কেউ হনহন করে এগিয়ে আসছে। অস্পষ্ট একটা মূর্তি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ আছে। লোকটা নদী পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসার পর চিনতে পারলুম।

লোকটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই! কিন্তু উনি কী করে জানলেন আমরা এই বনবাংলোতে উঠেছি?

আরও কাছাকাছি এসে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন এবং চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। বাংলোর সদর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরে গোয়েন্দাপ্রবর এসে গেলেন। বললুম,—আসুন হালদারমশাই! আপনাকে কে বললো আমরা এখানে আছি?

হালদারমশাই আড়ষ্টভাবে হেসে বললেন,—সেই গোবিন্দরে ফলো করছিলাম। মেসের ম্যানেজারের ফোন করছিলাম কাইল বিকালে। তিনি কইলেন, গোবিন্দ তারে কইছে, পীতাম্বরবাবু মারা গেছেন। পীতাম্বরবাবুর ভাগনা খবর আনছে। সেই ভাগনারে ম্যানেজারবাবু চেনেন। সে মাঝেমাঝে মেসে গিয়া মামার লগে থাকত। তো দুইজনে পীতাম্বরবাবুর জিনিসপত্র লইয়া হাবড়া স্টেশনে গেছে।

বললুম—আপনি তা হলে তখনই হাওড়া স্টেশনে ছুটে গিয়েছিলেন?

—ঘরে চলেন। সব কমু। কর্নেল সায়েব কই গেলেন?

—মর্নিংওয়াকে।

হালদারমশাই বারান্দায় বসে মাথায় জড়ানো মাফলার খুললেন। নাখুলাল এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম,—নাখুলাল! ইনি কর্নেলসায়েবের বন্ধু। শিগগির এর জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম হল ঃ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে গোবিন্দদের আবিষ্কার করতে পারেননি। অগত্যা ফিরে আসবেন ভাবছেন, সেই সময় তাঁর চোখে পড়ে, গোবিন্দ আর তার বয়সী এক যুবক বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামছে। অমনি তিনি আড়ালে গিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু রায়গড় যাওয়ার ট্রেন রাত বারোটায়। এনকোয়ারিতে খবর নিয়ে টিকিট কেটে হালদারমশাই তাদের চোখের আড়ালে অপেক্ষা করেন। অবশেষে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ভিড়লে তিনি গোবিন্দদের পিছনের কামরায় ওঠেন। ভোরবেলা রায়গড় স্টেশনে নেমে গোবিন্দ আর তার সঙ্গী একটা ট্রাকে জায়গা পেয়ে চলে যায়। হালদারমশাই বেশ কিছুক্ষণ পরে স্টেশনচত্বরে নেমে কীভাবে যাবেন, তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। একদল আদিবাসী সেই সময় হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন চত্বরে ঢুকছিল। তাদের জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন, হাঁটাপথে রায়গড় তত দূরে নয়। নাক বরাবর এগিয়ে তাদের বসতির ভেতর দিয়ে গেলে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্ব। সেই আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, রায়গড়ে কোনও হোটেল নেই। এদিকে ষষ্ঠীচরণ তাঁকে জানিয়েছিল আমরা রায়গড়ে এসেছি। কথায়-কথায় এক দাড়িওয়ালা সায়েবের খোঁজ নেন তিনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভের বুদ্ধি! তা ছাড়া তিনি প্রাক্তন এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। কর্নেল যে বনবাংলোয় উঠেছেন, সেই খবরও তিনি পেয়ে যান।

ইতিমধ্যে চা এনেছিল চৌকিদার। চা খেকে খেতে হালদারমশাই তাঁর কথা শেষ করে বললেন,—আদিবাসী ভদ্রলোকেরে পীতাম্বর রায়ের কথা জিগাইলাম। ও নামে রায়গড়ে কেউ নাই শুনিয়া ওনারে কইলাম, রায়গড়ের এক ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতেন। তিনি মারা গেছেন হঠাৎ। তখন ভদ্রলোক কইলেন, একজন জঙ্গলে কী সাংঘাতিক জানোয়ারের পাল্লায় পড়িয়া মারা গেছে বটে। তার নাম উপেন দত্ত। তখন গোবিন্দর কথা বললাম। ভদ্রলোক কইলেন, গোবিন্দ একজন গুণ্ডা। উপেন দত্ত লোকটাও ভালো ছিল না। গোবিন্দ ছিল তার এক চেলা!

এবার আমি উপেন দত্তের মৃত্যুর ঘটনা হালদারমশাইকে বললুম। এ-ও বললুম, উপেন দত্ত সত্যিই পীতাম্বর রায়। তবে গতরাতের ঘটনা বললুম না। বলতে হলে কর্নেলই বলবেন।

কর্নেল একা ফিরলেন, তখন নটা বাজে। তিনি হালদারমশাইকে দেখামাত্র বলে উঠলেন,—সুপ্রভাত হালদারমশাই! আমি কিছুক্ষণ আগে বাইনোকুলারে আপনাকে আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলুম। আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা নেই!

গোয়েন্দাপ্রবর জিভ কেটে বললেন,—লজ্জা দ্যান ক্যান কর্নেলস্যার? গোবিন্দ আর তার এক সঙ্গীরে ফলো করিয়া আইয়া পড়ছি!

কর্নেল নাখুলালকে ডেকে বললেন,—আমাদের এই গেস্টের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে নাখুলাল! আমি রেঞ্জারসায়েবকে খবর দেব। তোমার চিন্তার কারণ নেই। পাশের ঘরটা খুলে দাও। আর আমাদের তিনজনের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল পাশের ঘরের তালা খুলে দিল। তারপর ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে গেল। হালদারমশাই পাশের ঘরে উঁকি মেরে এসে বললেন,—নতুন ঘর! পেন্টের গন্ধ পাইলাম। ইলেকট্রিসিটি নাই?

কর্নেল বললেন,—নাঃ! তবে এখন শীতকালে অসুবিধে নেই। হ্যাঁ—মশা আছে! তাই মশারিও আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নাখুলাল ট্রেতে সাজিয়ে ঘিয়ে ভাজা লুচি, আলুর তরকারি আর সন্দেশ দিয়ে গেল। এখানে ভালো পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। তবে ঘি নাকি নির্ভেজাল। সন্দেশও উৎকৃষ্ট। ব্রেকফাস্টের পর কফি এল। নাখুলালকে বাজার করার টাকা দিলেন কর্নেল। সে সাইকেলে চেপে চলে গেল।

কফি খেতে খেতে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—দুর্গের ধ্বংসস্তূপে সুরেনকে নিয়ে ঘুরছিলেন দেখেছি। ওখানে কি কিছু আবিষ্কার করলেন?

কর্নেল বললেন,—আবিষ্কার করার অনেক কিছু এখনও থাকতে পারে ওখানে। তবে সেটা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ। আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কাল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী আর ডঃ চট্টরাজ ওখানে কী কারণে গিয়েছিলেন। ঘুরতে-ঘুরতে একটা ধ্বংসস্তূপের ভেতর গুহার মতো জায়গা চোখে পড়ল। ছোট্ট গুহার সামনে লতার ঝালর ছিল। সুরেন বলল, একবার দীপু তাকে এই গুহাটা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। গুহার ভেতর কালো লোম পড়ে থাকতে দেখে তারা ভেবেছিল ওখানে ভালুক থাকে। তাই তখনই সেখান থেকে দুজনে পালিয়ে গিয়েছিল। দৈবাৎ ভালুকটা যদি এসে পড়ে! তো আমিও ওখানে ভালুকজাতীয় জন্তুর লোম পড়ে থাকতে দেখলুম।

বললুম,—উপেনের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, সেখানেও তো লোম কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এদিকে নাখুলালও কাল ভালুক দেখে চিৎকার করছিল। কিন্তু আমার এখনও ধারণা জন্তুটা ভালুক নয়।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—ভালুক যদি অ্যাটাক করতে আসে, গুলি করব।

কর্নেল হাসলেন,—না হালদারমশাই! জন্তুটা সম্ভবত ভালুক নয়। তবে

দৈবাৎ আপনি জন্তুটাকে দেখতে পেলে গুলি ছুড়বেন না। আপনার রিভলভার দেখাতে পারেন! তাতেই জন্তুটা ভয় পাবে।

—রিভলভার দেখলে ভালুক ভয় পাবে? কন কী কর্নেলস্যার?

পাবে। —বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন ঃ আপনি ঘুমিয়ে নিন। আমাদের ঘরে তালা এঁটে দিয়ে আমরা এবার বেরুব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিন। আমরা বারোটা নাগাদ ফিরব।

বাংলোর নিচের রাস্তায় নেমে কর্নেল বললেন,—সুরেনকে কুমুদবাবুর কাছে আমাদের আসার খবর দিতে পাঠিয়েছি। আমরা আদিবাসী বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে যাব।

অদিবাসী বস্তিটি বেশ পরিচ্ছন্ন। কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগ আঁটা, গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তারা তাঁকে বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে তাদের গির্জাঘর, স্কুল, এমনকি জঙ্গলে তাদের পূর্বপুরুষের ঠাকুরবাবার থান দেখাতে চাইছিল। কিন্তু কর্নেলের মুখে বাংলা শুনে তাদের আগ্রহ কমে গেল।

বস্তি পেরিয়ে বাঁ দিকে সেই খেলার মাঠে পৌঁছুলুম। মাঠের পূর্বপ্রান্তে সেই পিচরাস্তা দেখা গেল। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে আমরা কিছুটা গেছি, তখন সুরেনকে দেখতে পেলুম। সুরেন বললো,—মাস্টারমশাই বাড়িতে আছেন। আপনার আসার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁর বাড়ি কি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে?

সুরেন আঙুল তুলে বললো,—ওই তো! শেষ দিকটায় বটগাছের ফাঁক দিয়ে একতলা পুরনো বাড়ি!

কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তরদিকে অবস্থিত রায়গড় খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন,—চলো!

কুমুদ ভট্টাচার্য তাঁর বাড়ির উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে অভ্যর্থনা করে বসার ঘরে ঢোকালেন! তিনি বললেন,—আপনি দয়া করে এসেছেন। আমার মনে আশা জেগেছে, দীপুকে আপনি উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু ওদিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার! কেষ্টবাবুর সঙ্গে সেদিন কলকাতায় আপনার কাছে গিয়েছিলুম, সেদিনকার একটা খবরের কাগজে দীপুর ছবি ছাপিয়ে কে লিখেছে—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—হ্যাঁ। আপনারা চলে যাওয়ার পর বিজ্ঞাপনটা আমি দেখেছি।

কুমুদবাবু বললেন,—বাড়ি ফিরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি তো অবাক। কেষ্টবাবুর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে বলেছিলুম। উনি বললেন,

কর্নেলসায়েবের নিশ্চয় এটা চোখে পড়েছে। উনি পীতাম্বর রায়ের ঠিকানায় খোঁজ নেবেন।

—নিয়েছি। সে এই রায়গড়ের লোক। তা ছাড়া আপনি শুনলে আরও অবাক হবেন, তার নাম উপেন দত্ত, যে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে মারা পড়েছে!

কুমুদবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন,—আমার ধারণা, এটাই দীপুর পড়ার ঘর!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক মিনিট। আমি আসছি।

বলে কুমুদবাবু ভেতরে চলে গেলেন। ঘরের একধারে একটা ছোট তক্তপোশে বিছানার ওপর বেডকভার চাপানো আছে। তার পাশে দেওয়াল ঘেঁসে টেবিল এবং চেয়ার। টেবিলের ওপর পড়ার বই এবং খাতাপত্র সাজানো। টেবিলসংলগ্ন দেওয়ালে কাঠের র‍্যাক। চারটে র‍্যাকে বই ঠাসা আছে। কর্নেল উঠে গিয়ে সেই র‍্যাকের নতুন ও পুরনো বই দেখতে থাকলেন। বললেন,—নানা বিষয়ের বই পড়ত দীপু। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের বইও বেশি। খেলাসংক্রান্ত বইও দেখছি।

বলে কর্নেল খেলাসংক্রান্ত একটা বই টেনে নিলেন। পাতা উল্টে দেখতে থাকলেন। সেটা দেখার পর আর একটা খেলার বই টেনে বের করলেন। তারপর লক্ষ করলুম, এই বইটার ভেতর থেকে কর্নেল একটুকরো কাগজ বের করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করলেন।

সেই সময় কুমুদবাবু এসে গেলেন। বললেন,—দীপুর খেলাধুলোয় যেমন, তেমনই নানারকম বই পড়ার আগ্রহ ছিল।

কর্নেল বইটা র‍্যাকে ঢুকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। তা-ই দেখছিলুম।

একজন ফ্রক পরা কিশোরী চায়ের ট্রে রেখে গেল। কুমুদবাবু বললেন,—গরিব মানুষ। আপনার সেবাযত্ন করার ক্ষমতা নেই। নেহাত চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করছি।

কর্নেল বললেন,—আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনার অ্যাপায়নের দরকার নেই। অবশ্য চা খেতে আপত্তি নেই। কফির পর চা খেতে মন্দ লাগে না।

সুরেনকে কুমুদবাবু চায়ের কাপ-প্লেট নিজের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—সুরেন দীপুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীপু নিখোঁজ হওয়ার পর দীপুর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই খুব ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে।

চা খেতে খেতে কর্নেল বললেন,—আপনি তো স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার আগে আপনি রায়গড় রাজবাড়ির পারিবারিক লাইব্রেরি দেখাশুনা করতেন শুনেছি?

কুমুদবাবু কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন,—একটা কথা আপনাকে কেষ্ট অধিকারীর সামনে বলার সুযোগ পাইনি। সুরেনের সামনে বলা যায়। রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে একখানা সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল। কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায় সেই পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করতে বলেছিলেন আমাকে। পাণ্ডুলিপিটা আমি দেখেছিলুম। কিন্তু কদিন পরে গিয়ে শুনি, ওটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমুদ চুপ করলেন। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তারপর?

কুমুদবাবু আরও চাপাস্বরে বললেন,—আমার সন্দেহ হয়েছিল, রাজবাড়ির এক কর্মচারি মাখন দত্ত রাজবাড়ির অনেক জিনিস চুরি করে তার ভাই উপেন দত্তের সাহায্যে বিক্রি করত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাখনই পাণ্ডুলিপি চুরি করেছিল। মাখনকে কুমারবাহাদুর বিশ্বাস করতেন। আমার সামনেই তাকে উনি বলেছিলেন, ওতে তাঁর পূর্বপুরুষের একটা গোপন কাহিনী আছে। মোগল বাদশাহ্ আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ নাকি তাঁর পূর্বপুরুষকে একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। তার ভেতরে ছিল অমূল্য কী একটা রত্ন। কিন্তু কীভাবে সেই জিনিস খুলে রত্নটা বের করতে হয়, তা মানসিংহ বলেননি। তিনি বলেছিলেন, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অঙ্ক কষে রত্নটা বের করে নেবেন।

—তারপর?

—মানসিংহের সেই উপহার কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, রাজবংশের কেউ তার হদিস পাননি। শুধু পাণ্ডুলিপিতে হয়তো তার হদিস ছিল। আমি খুঁটিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনি। হাতের লেখা। তার ওপর নাগরী লিপি। তবে একটা শ্লোকে চোখ বুলিয়ে দেখেছিলুম একটা জটিল অঙ্কের কথা আছে। অঙ্কটা অদ্ভুত।

—আপনার কি মনে আছে অঙ্কটা?

—হ্যাঁ। এক থেকে পনের পর্যন্ত পনেরোটি সংখ্যা চার সারিতে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে উপরে, নিচে এবং দু'ধারে যোগ করলে যোগফল হবে বত্রিশ।

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ। বত্রিশের ধাঁধা! তা আপনি কি দীপুকে অঙ্কটার কথা বলেছিলেন?

—বলেছিলুম। দীপু অঙ্কে খুব পাকা।

—কবে বলেছিলেন?

—যখন শ্লোকটা পড়ি, তখন দীপুর জন্মই হয়নি। কিন্তু অঙ্কটা আমার মনে ছিল! গত পুজোর সময় একদিন উপেন দত্ত আমার বাড়িতে এসেছিল। সে দীপুর খোঁজ করছিল। দীপুকে সে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পরে দীপু নিখোঁজ হলে উপেনের উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে দীপু; উপেন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বলেছিল, আমাকে জানায় নি। উপেন তাকে কলকাতা থেকে অনেকগুলো বই কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। তাই আমি ভেবেছিলুম, দীপুর যেসব বই পড়ার ইচ্ছে, তা আমি কিনে দিতে পারি না। তাই দীপু হয়তো উপেনকাকুকে সেই সব বইয়ের কথা বলেছিল। দীপু উপেন দত্তকে উপেনকাকু বলত। কিন্তু তারপর দীপু কেন যেন উপেনকে এড়িয়ে চলত। বলত, লোকটা ভালো নয়।

—উপেনের সঙ্গে মিঃ অধিকারীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

কুমুদবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—উপেন কলকাতায় ব্যবসা করত শুনেছি। তবে চোরাই মালের কারবারি বলে এখানে তার বদনাম ছিল। কেষ্টবাবুর সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তাহলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে দীপুর ছবি দেখে আপনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু পীতাম্বর রায় যে উপেন দত্ত, তা বুঝতে পারেননি?

—আজ্ঞে না। কেষ্ট অধিকারীও পারেনি। তবে আমাদের দুজনেরই সন্দেহ হয়েছিল, দীপুকে সে অপহরণ করেছিল, দীপু যে-ভাবে হোক তার হাত থেকে পালিয়েছে। কিন্তু সে বাড়ি ফিরল না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আমার অঙ্কটা এবার বলি। দীপু যার সাহায্যে উপেনের হাত থেকে পালিয়েছিল, সম্ভবত তার হাতেই আবার বন্দি হয়েছে। আপনার কাছে পাঠানো উড়ো চিঠি থেকে বোঝা যায়, দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার সমাধান করেছিল। কিন্তু তা উপেন দত্তকে দিতে চায়নি বলেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার খোঁজ দেয়নি। সে নিশ্চয় বলেছিল, তার খাতাপত্রের ভেতর কোথাও ওটা আছে।

—কিন্তু আমি তন্নতন্ন খুঁজেও তা পাইনি।

এইসময় বাইরে কেউ ডাকল,—কুমুদ! কুমুদ! ওহে ভট্টাচার্য!

কুমুদবাবু উঁকি মেরে দেখে আস্তে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী এসেছেন।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ঘরে ঢুকে কর্নেলকে দেখে বললেন,—কর্নেলসায়েবের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি নতুন ফরেস্টবাংলোয় উঠেছেন, সেই খবর একটু আগে পেলুম। তাই ভাবলুম, কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাব।

কর্নেল বললেন,—মিঃ অধিকারী! এখান থেকে এবার আপনার বাড়িতে যেতুম।

## ॥ সাত ॥

কুমুদবাবুর বাড়ির পিছনদিকে একটা গলিরাস্তায় কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। কুমুদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সেই গাড়িতে গিয়ে চাপলুম। সুরেন বেচারা মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল তাকে বললেন,—তুমি বরং বাংলোয় গিয়ে খুড়োর রান্নাবান্নায় সাহায্য করো!

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পুরোনো বসতি এলাকা ছাড়িয়ে নতুন টাউনশিপে পৌঁছলুম। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ অধিকারী বললেন,—কুমুদ ভট্টাচার্যের পাড়ায় একজনের বাড়ি গিয়েছিলুম। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্ত নামে একটা লোক নাকি ভালুকের কামড়ে মারা পড়েছে। উপেনের সঙ্গে আমাদের একটুখানি কারবারি সম্পর্ক ছিল। লোকটা বজ্জাত ছিল ঠিকই। তবে দালাল হিসেবে ব্যবসাবাণিজ্যে তার বুদ্ধি ছিল প্রখর। তার দাদা মাখন দত্ত জমিদারবাড়ির কর্মচারি ছিল। নগেনই আমাকে ডেকেছিল। নগেন এখন চলাফেরা করতে পারে না। তাই আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলুম। সেইসময় মাখনের ভাগনে বিজয় বলল, কুমুদমাস্টারের বাড়িতে একজন দাড়িওয়ালা সায়েব এসেছেন! মিঃ অধিকারী হাসতে হাসতে বললেন—অমনি বুঝলুম আপনি এসেছেন। এদিকে বনদফতরের রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জির সঙ্গে সকালে বাজারে দেখা হয়েছিল। সে কথায়কথায় আপনাদের খবর দিল। অমল আমার এক বন্ধুর ছেলে। দুর্গাপুরের ওদিকে থাকত। সম্প্রতি এখানে বদলি হয়ে এসেছে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—মাখনবাবু কি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে ডেকেছিলেন?

মিঃ অধিকারী গাড়ির স্পিড কমিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। মাখনের সন্দেহ, তার ভাইকে কেউ খুন করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিল। আমি যেন পুলিশকে একটু বলে দিই। কিন্তু উপেন পুলিশরেকর্ডে দাগি স্মাগলার। কিছু করা যাবে না।

—আচ্ছা মিঃ অধিকারী, আপনি কি গোবিন্দ নামে কাকেও চেনেন?

মিঃ অধিকারী হাসলেন,—কুমুদ গোবিন্দের কথা বলছিল বুঝি?

—নাঃ! আমি আদিবাসী বস্তির একজনের কাছে শুনেছি, গোবিন্দ নামে উপেনবাবুর এক সাগরেদ ছিল। সে নাকি কলকাতা থেকে রায়গড়ে ফিরে এসেছে।

একটু পরে মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। গোবিন্দটা যেমনই গোঁয়ার, তেমনই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছোকরা। এখানে বজ্জাতি করে বেড়াত বলে ব্যবসায়ীরা ওর পিছনে পুলিশ লাগিয়েছিল। গোবিন্দ কলকাতায় গিয়ে উপেনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরে এসেছে, সে-খবর মাখনবাবুর কাছে পেয়েছি। সত্যি

বলতে কী, আমি একটু উদ্বিগ্ন হঠে উঠেছি। গোবিন্দ রায়গড়ের দুর্বৃত্তদের লিডার হয়ে উঠতে পারে।

মিঃ অধিকারীর দোতলা বিশাল বাড়ি দেখে বুঝলুম, তিনি বনেদি ধনী পরিবারের বংশধর। উঁচু পাচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গার ওপর পুরনো বাড়ির চেহারা একেলে করা হয়েছে। রঙবেরঙের ফুলের বাগান এবং কেয়ারিকরা নানারকম দেশিবিদেশি গাছ চোখে পড়ল। নুড়িবিছানো লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াল।

মিঃ অধিকারী আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা আধুনিক আসবাবে সাজানো। নানা দেশের সুন্দর সব ভাস্কর্য, প্রকাণ্ড ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হলেও রুচিশীল। এমন মানুষের সঙ্গে উপেন দত্তের সম্পর্ক যেন মানায় না।

তিনি একটা লোককে আমাদের জন্য কফি আনতে বলে মুখোমুখি বসলেন। প্রশস্ত ঘরটার মেঝে পুরোটা চিত্রবিচিত্র এবং নরম কার্পেটে ঢাকা। কর্নেল বললেন,—ঘরটা নতুন করে সাজিয়েছেন দেখছি!

মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। আমার ছেলে তীর্থঙ্কর আমেরিকার নিউজার্সি এলাকায় থাকে। সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট আর কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স শেষ করে পুজোর আগে ফিরবে। কী আর বলব বলুন? তীর্থঙ্কর ওখানে একটি মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছে। বউমা ইতিমধ্যে বাংলা শিখে নিয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। —ভালোই তো।

দুজনে এইসব নিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমার মনে হচ্ছিল, কেন কর্নেল কোনও অছিলায় প্রত্নবিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের কথা তুলছেন না? মিঃ অধিকারীর সঙ্গে গতকাল সকালে তো দুর্গের ধ্বংসস্তূপে ডঃ চট্টরাজকে কর্নেল দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই লোকটা ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স এনে বললো,—এখনই একবার ওপরে চলুন আজ্ঞে! আসানসোল থেকে বাচ্চুবাবুর টেলিফোন এসেছে! গিন্নিমা আমাকে বললেন।

কথাটা শুনেই মিঃ অধিকারী হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সেইসময় কর্নেল লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, আমার নাম ভুজঙ্গ।

—তোমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি কি চলে গেছেন?

আজ্ঞে কলকাতা থেকে তো কেউ এ বাড়িতে আসেননি! —বলেই সে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—আজ্ঞে, কাল এক ভদ্রলোক কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর কর্তাবাবু তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, তিনি উঠেছেন নদীর ধারে সরকারি ডাকবাংলোতে। কলকাতারই লোক বটে।

কর্নেল পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন,—তোমার কর্তাবাবুকে যেন এসব কথা বোলো না। মুখটি বুজে থাকবে। কেমন?

ভুজঙ্গ প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে চাপা স্বরে বললো,—আজ্ঞে! কী বলব সার আপনাকে? আমার কর্তবাবু হাড়কেপ্পন লোক। মাসে খোরাকি আর পঁচিশ টাকা মাইনে।

—তোমার বাড়ি কি রায়গড়েই?

—না সার! মদনপুরে আমার বাড়ি। মাস ছয়েক হল, এ বাড়িতে কাজে লেগেছি। শিগগির এ কাজ ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি। সার! কলকাতায় আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দেবেন?

—দেখব। তুমি গোপনে বনবাংলোয় আমার সঙ্গে সময়মতো দেখা কোরো!

লোকটা কৃতার্থ হয়ে সেলাম করে চলে গেল। বললুম,—আপনি কী করে বুঝলেন ভুজঙ্গকে ঘুষ খাইয়ে ডঃ চট্টরাজের খবর পাওয়া যাবে? ও যদি মুখ ফসকে মিঃ অধিকারীকে—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে মুচকি হেসে বললেন,—অবজারভেশন জয়ন্ত! পর্যবেক্ষণ! এমন একটা অভিজাত বাড়িতে অতিথির জন্য যে ট্রে নিয়ে আসছে, তার ট্রে আনার ভঙ্গি এবং মুখের হাবভাব দেখেই অনুমান করা যায়, পরিচারক এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত, না অনভ্যস্ত! এ সব পরিবারের কাজের লোকেরা স্মার্ট হয়। ভুজঙ্গকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, সে নেহাত গ্রাম্য লোক এবং এখনও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি।

বলে কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমার কফি পানের ইচ্ছা দিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেয়ালা হাতে নিতে হল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ অধিকারী ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বললেন,—আমি দুঃখিত কর্নেলসায়েব! আসানসোল হেড অফিস থেকে আর্জেন্ট কল এসেছে। আমাকে এখনই গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে। সম্ভবত কাল সকালে ফিরে আসব। না, না। আপনারা কফি শেষ করে নিন। আমি রেডি হয়ে আসি। আপনাদের আমি বনবাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে যাব।

কর্নেল বললেন,—আমাদের জন্য ভাববেন না। তিনবছর পরে রায়গড়ে এলুম। একটু ঘোরাঘুরি করতে চাই।

আমরা শিগগির কফির পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রাখলুম। ভুজঙ্গ হাসিমুখে এসে ট্রে নিয়ে গেল। তারপর মিঃ অধিকারী টাই-স্যুট পরে ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে এলেন। আমরা দুজনে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে গেট পেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম, মিঃ অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা সবেগে বেরিয়ে গেল।

নিউ টাউনশিপ এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটি একতলা বা দোতলা বাড়ির সামনে পিছনে ফুল-ফলের গাছ। হাঁটতে হাঁটতে একটা চৌরাস্তার কেন্দ্রে বসানো উঁচু বেদির ওপর নেতাজির প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন,—একটা সাইকেলরিকশ পেলে ভালো হত।

জিজ্ঞেস করলুম,—কোথায় যাবেন?

—ডাকবাংলোয়।

—সর্বনাশ! ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—সর্বনাশ কীসের? তিনি যদি রায়গড়ে বেড়াতে আসতে পারেন, আমরাও কি আসতে পারি না? উনি তো জানেন রায়গড় আমার প্রিয় ঐতিহাসিক জায়গা!

চৌরাস্তা থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে একটা খালি সাইকেলরিকশ পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশওয়ালাকে বললেন,—ডাকবাংলো চলো!

নিউ টাউনশিপ এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। এবার বাঁদিকে সেই শীর্ণ নদীর অন্য রূপ চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে ভাঙন রোধের জন্য গাছপালা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সমান্তরালে জলভরা ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে। তারপর সরকারি ডাকবাংলো চোখে পড়ল। একতলা সেকেলে বাংলোর ভোল ফেরানো হয়েছে। রঙিন টালির চাল এবং চারদিকে বারান্দা। লনের দুপাশে ফুলবাগিচা আর দেশিবিদেশি বিচিত্র সব কেয়ারিকরা গাছ।

কর্নেল রিকশওয়ালাকে বললেন,—তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমরা এখনই আসছি।

বাঁদিকে সবুজ ঘাসের ওপর একটা বেতের চেয়ারে সম্ভবত কোনও হোমরাচোমরা সরকারি অফিসার বসে রোদের আরাম নিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের একবার তাকিয়ে দেখলেন মাত্র। বারান্দার সিঁড়ির ওপর উর্দিপরা একটা লোক বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল।

কর্নেল বললেন,—ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি তাঁকে খবর দাও।

লোকটা বললো,—ওই নামে কেউ বাংলোয় নেই সার!

—তা হলে আমার শুনতে ভুল হয়েছে। এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসেছেন। ফর্সা, লম্বা, মুখে—মানে চিবুকে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে চশমা...

—বুঝেছি সার! আপনি কেষ্ট অধিকারীমশাইয়ের বন্ধুর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিক ধরেছ।

—সার! উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। রিকশ ডেকে দিলুম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে মুখে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! আমার সঙ্গে ওঁর দেখা করার কথা ছিল! হঠাৎ কেন চলে গেলেন?

লোকটা বলল,—ওঁকে অধিকারীমশাই টেলিফোন করেছিলেন। তাই চলে গেলেন।

—আর ফিরে আসবেন না বলে গেছেন নাকি?

—হ্যাঁ সার।

—ওঁর নামটা ভুলে যাচ্ছি। ট্রেনে আসবার সময় আলাপ হয়েছিল। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ, না...

—সার! চট্টরাজ নয়। চ্যাটার্জি সায়েব। ডি চ্যাটার্জি। বড় সরকারি অফিসার।

—ঠিক বলেছ!

বলে কর্নেল চলে এলেন। সাইকেলরিকশতে চেপে বললুম,—বড্ড গোলমেলে ঘটনা কর্নেল!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—মিঃ অধিকারী দেখছি গভীর জলের মাছ। কলকাতায় কুমারবাহাদুরের কথা শোনার পরই তাঁর সম্পর্কে আমার সন্দেহ জেগেছিল। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, কুমুদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উনি যখন আমার কাছে যান, তখন উনি দীপুর অন্তর্ধান রহস্যের মূল কারণটা জানতেন না। সম্ভবত পীতাম্বর রায় অর্থাৎ উপেন দত্ত এখানে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর উপেন সম্ভবত মিঃ অধিকারীর কথায় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে পুঁতে রাখা প্রাচীন রত্নকোষ—হ্যাঁ, জিনিসটাকে প্রাচীন যুগে রত্নকোষ বলা হত—

ওঁর কথার ওপর বললুম,—ঠিক বলেছেন। মিঃ অধিকারীই হয়তো রত্নকোষ বিনা পয়সায় বাগিয়ে নেওয়ার জন্য জঙ্গলের ভেতর উপেনকে খুন করেছেন।

রিকশওয়ালার দিকে ইসারা করে কর্নেল আস্তে বললেন,—চুপ! এখন কোনও কথা নয়।

কিছুক্ষণ পরে রিকশওয়ালা জিজ্ঞেস করল,—আপনারা কি চৌরাস্তার কাছে নামবেন সার?

কর্নেল বললেন,—না। তুমি হাইওয়েতে চলো। রংলিডিহির মোড়ে আমরা নামব।

রংলিডিহি নাখুলালদের বস্তির নাম, তা ভুলে গিয়েছিলুম। হাইওয়ে ওই আদিবাসী বস্তির প্রান্তে ধনুকের মতো বেঁকে আবার সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। বাঁকের মুখে নেমে রাঙামাটির এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হেঁটে বনবাংলোয় পৌঁছুতে মিনিট পনেরো লাগল। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াইয়ে উঠেছে। বাংলোর গেটের কাছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন,—জঙ্গলে কী একটা জানোয়ার আছে। আমি ফায়ার করার সুযোগ পাই নাই। নাখুলালের মুখে যা শুনছি তা মিথ্যা না।

কর্নেল বললেন,—একটা পনেরো বাজে। স্নান করেননি কেন?

হালদারমশাই বললেন,—যা ঘটছে, স্নানের কথা মাথায় ছিল না। চলেন। সব কইতাছি।

আমাদের ঘরের তালা খুললেন কর্নেল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের জানালা আমিই খুলে দিলুম। নাখুলাল এসে সেলাম দিয়ে বলল,—সুরেন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বাড়ি গেল। খেয়েদেয়ে আসবে। আপনারা কখন যাবেন সার?

কর্নেল বললেন,—দেড়টায়। এখন সওয়া একটা বাজে।

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি নাখুলালের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাংলোর পিছনে গিয়েছিলেন। তার মুখে জঙ্গলের হাড়মটমটিয়া নামে অদ্ভুত জন্তুর কথা শোনেন। তারপর উপেন দত্তের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, তিনি খুঁজতে খুঁজতে সেখানে যান। তারপর হঠাৎ তাঁর বাঁদিকে ঘন ঝোপের ভেতর মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙার মতো শব্দ শুনতে পান। অমনই তিনি রিভলভার বের করে সেদিকে সাবধানে এগিয়ে যান। কী একটা কালো ভালুকের মতো জন্তুকে আবছা দেখামাত্র তিনি রিভলভার তাক করেন। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, জন্তুটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাহস করে ঝোপের কাছে গিয়ে তিনি অনেক কালো লোম দেখতে পান। জন্তুটা যে ভালুক নয়, তার কারণ বুনো ভালুক মানুষ দেখামাত্র তেড়ে আসে। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সে অদৃশ্য হল কেন? পিছনের জঙ্গল আরও ঘন। সেখানে একটা বিড়াল গলে যাওয়ার উপায় নেই।

শোনার পর কর্নেল বললেন,—ওসব নিয়ে ভাববেন না। আর জঙ্গলেও যেন একা যাবেন না। লাঞ্চ খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসব।

খাওয়ার পর অভ্যাসমতো আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাতঘুমের চেষ্টায় ছিলুম। কর্নেল এবং হালদারমশাই খোলামেলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুটো

চেয়ারে মুখোমুখি বসে চাপা স্বরে কথা বলছিলেন। বুঝতে পেরেছিলুম, কর্নেল এবার গোয়েন্দাপ্রবরকে পুরো ঘটনা ব্যাকগ্রাউন্ডসমেত জানাতে চান।

কতক্ষণ পরে আমার ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গিয়েছিল কর্নেলের ডাকে। শীতের রোদ ফিকে সোনালি হয়ে উঠেছে। চারটে বেজে গেছে। আমি উঠে বসলে কর্নেল বললেন,—শিগগির তৈরি হয়ে নাও। সঙ্গে তোমার ফায়ারআর্মস নেবে।

বললুম,—এসময় এক পেয়ালা চা বা কফি খেলে শরীরটা চাঙ্গা হত।

কর্নেল হাসলেন,—ওই দেখ, টেবিলে প্লেট ঢাকা দেওয়া তোমার চায়ের কাপ। আমি আর হালদারমশাই কফি খেয়ে নিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—হালদারমশাইও যাচ্ছেন তো?

—উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন।

—ওঁকে কোথায় পাঠালেন?

—আসানসোলে মিঃ অধিকারীর হেডঅফিসে। সেখানে ওঁর একটা বাড়িও আছে। সুরেন হালদারমশাইকে রংলিডিহির মোড়ে বাসে তুলে দেবে। ঘণ্টাতিন সময় লাগবে।

ওঁকে আসানসোলে পাঠালেন কেন?

কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ এঁটে গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। চোখ কটমটিয়ে ধমক দিলেন,—নো কেন! চা গিলে শিগ্‌গির তৈরি হও। অত কেন-কেন কেন?

আমি সত্যিই চা গিলে ফেলে তৈরি হয়ে নিলুম। এবার কর্নেল সহাস্যে বললেন,—বাঃ! এই তো চাই।

কর্নেল জানালা বন্ধ করে তালা এঁটে নাখুলালকে বললেন,—বেরুচ্ছি নাখুলাল!

নাখুলাল কালকের মতো মালীর সঙ্গে গল্প করছিল। সেলাম দিয়ে বললো,—কখন ফিরবেন সার?

—যদি একটু রাতও হয়, তুমি চিন্তা কোরো না।

কর্নেল বাংলো থেকে নেমে রাঙামাটির সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কর্নেল! আপনি আজ অবিকল এক মন্ত্রীমশাইয়ের মতো বলছিলেন, অত কেন-কেন কেন? অবশ্য তারপরও তিনি আমাদের সাংবাদিকদলটিকে ভেংচি কেটে বলেছিলেন, খালি কেনর ক্যানেস্তারা!

কর্নেল বললেন,—তোমার নার্ভ চাঙ্গা হয়ে গেছে। এবার শোনো! রংলিডিহির মোড়ে সুরেন হালদারমশাইকে বাসে তুলে দিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে আমরা যাব মাখন দত্তের বাড়ি।

—উপেন দত্তের দাদা মাখন দত্ত। তাই না?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। যাই হোক, তুমি ওখানে যাচ্ছ সাংবাদিক পরিচয়ে, যা তোমার প্রকৃত পরিচয়। উপেন দত্তের মৃত্যুসম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য তুমি কলকাতা থেকে এসেছ। বুঝেছ তো? এবার পরের কথাটা মন দিয়ে শোনো। এ ছাড়া কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর জঙ্গলে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তুমি সকালে কুমুদবাবুর বাড়ি গিয়ে সব খবর নিয়েছ। কেমন?

—বুঝেছি।

—তুমি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবে। সান্ত্বনা দেবে। সরকারি সাহায্যের জন্য দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখবে—একথাও বলবে। মাখনবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর দেখা রায়গড় রাজবাড়ি এবং রাজলাইব্রেরির কথাও তুলবে। তারপর মওকা বুঝলে সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটার—

কর্নেলের কথা শেষ হল না। অতর্কিতে সংকীর্ণ এবং এবড়োখেবড়ো রাস্তার বাঁদিকের ঘন ঝোপ থেকে কেউ কর্নেলের দিকে প্রায় ঝাঁপ দিল। আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। তারপর দেখলুম, কর্নেল আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আততায়ীর তলপেটে স-বুট লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে ধরাশায়ী হল। কর্নেল তার পিঠের ওপর দমাস করে বসে রিভলভার বের করে তার কানের পাশে ঠেকিয়ে বললেন,—ট্রিগার টানলেই কী হবে তুমি বুঝতে পারছ তো?

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়েছে। ছোরাটার ফলা প্রায় ছ'ইঞ্চি। ওটা কুড়িয়ে নিলুম। এবার আমার হাতে রিভলভার।

কর্নেলের মতো প্রকাণ্ড এবং ওজনদার মানুষ তার পিঠে বসেছিলেন এবং তার ফলে তার মুখটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। কর্নেল এবার তার দু'হাত পিছনে টেনে আমাকে বললেন,—আমার ব্যাগে দড়ি আছে। শিগ্‌গির বের করে দাও।

কর্নেলের পিঠে আঁটা ব্যাগের চেন টেনে নাইলনের শক্ত দড়ি বের করে দিলুম। আমি জানি, এই ব্যাগে স্ক্রুড্রাইভার থেকে শুরু করে সবরকমের জিনিস ভরা থাকে। কর্নেল দড়িতে আততায়ীর হাত দুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ওর পিঠ থেকে নামলেন। তারপর চুল খামচে ধরে তাকে দাঁড় করালেন। রক্তাক্ত মুখে সে হাঁফাচ্ছিল। কর্নেল তার পাঁজরে একটা ঘুসি মেরে বললেন.—তোর নাম গোবিন্দ। তাই না?

আততায়ী বয়সে তরুণ। এখনও রক্তাক্ত মুখে তাকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। সে কোনও কথা বললো না। কর্নেল মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে

বললেন,—চলো! এই শয়তানটাকে জঙ্গলের ভেতর একটা গাছে বেঁধে রেখে আসি। হাড়মটমটিয়া খুবলে খুবলে এর মাংস খাবে।

কর্নেল এই বলে তাকে টেনে বাঁদিকে জঙ্গলে ঢোকানোর ভঙ্গি করতেই সে বিকট ভাঙা গলায় কেঁদে উঠল,—আর এমন করব না সার। আমি টাকার লোভে—ও হো হো! বাবা গো!

কর্নেল বললেন,—আগে বল্ তোর নাম গোবিন্দ? মিথ্যা বললে তোকে গাছে বেঁধে রেখে আসব।

সে গোঙানো গলায় বললো,—হ্যাঁ সার। আমি গোবিন্দ।

কে তোকে টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে খুন করতে বলেছে? —বলে কর্নেল তার চুল ওপড়ানোর মতো সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

গোবিন্দ হাঁফাতে হাঁফাতে বললো,—কেষ্টবাবু সার! আজ আসানসোল যাবার সময় আমাকে বলেছিল, দাড়িওলা সায়েবকে খুন করলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে।

কর্নেল আবার তার চুলে টান দিয়ে বললেন,—কুমুদবাবুর ছেলে দীপু কোথায়?

—মা কালীর দিব্যি, জানি না সার! উপেনদা তাকে কলকাতায় একজনের বাড়িতে রেখেছিল। দীপু সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

এই সময় একদল আদিবাসী মজুর হাঁটাপথে রায়গড় স্টেশন থেকে আসছিল। তারা এসে নিজেদের ভাষায় হইচই করতে থাকল। একজন বাংলায় বললো,—সায়েব! এর নাম গোবিন্দ গুণ্ডা। পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। আমাদের বস্তিতে গিয়েও এই বজ্জাত গুণ্ডা যাকে খুশি, খামোকা মারধর করে টাকা আদায় করত। এই গুণ্ডাটা রংলিডিহিতে ঢুকলে আমাদের বউঝিরা ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ত। একে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

বলে সে আদিবাসী ভাষায় কিছু বললো। দুজন দৌড়ে চলে গেল। কর্নেলের নির্দেশে ছোরাটা ভাঁজ করে গোবিন্দের প্যান্টের পকেটে ভরে দিলুম। কর্নেল আদিবাসীদের ঘটনাটা শোনালেন। একজন প্রৌঢ় আদিবাসী আচমকা গোবিন্দর পিঠে এক কিল মেরে নিজেদের ভাষায় কিছু বললো। বুঝলুম, অতীতে গোবিন্দ তার কোনও ক্ষতি করেছিল।

একটু পরে রংলিডিহি থেকে ধামসা আর কাঁসি বাজাতে বাজাতে একদল লোককে আসতে দেখলুম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! ওরা গোবিন্দকে হয়তো গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলবে। তার আগে তুমি আর আমি রিভলভার থেকে শূন্যে গুলি ছুড়ে ওদের থামানোর চেষ্টা করব।

এই কথা শুনে সেই আদিবাসী লোকটা বললো,—আমি এগিয়ে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বলছি সার। তা না হলে রংলিডিহির লোকেরা গোবিন্দকে আস্ত রাখবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন।

কথাটা বলে সে এবং আরও দুজন লোক দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল।

## ॥ আট ॥

সবে আদিবাসী লোক তিনটি ছুটে গেছে এবং সামনে ধামসা-কাঁসি বাজানো রংলিডিহির ক্রুদ্ধ আদিবাসী জনতা গর্জন করতে করতে তেড়ে আসছে, এই সময় পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় গোবিন্দের দিকে যেমন আমার, তেমনই কর্নেলের লক্ষ্য না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আর এই সুযোগে ওই অবস্থায় গোবিন্দ আচম্বিতে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

এই আকস্মিক ঘটনার জন্য তৈরি ছিলুম না। শুধু চেঁচিয়ে উঠলুম,—ধর! ধর! পালিয়ে যাচ্ছে! পালিয়ে যাচ্ছে!

কর্নেল গোবিন্দকে ধরার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আদিবাসী জনতাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তাদের একটা দল লাঠি-বল্লম-কাটারি হাতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

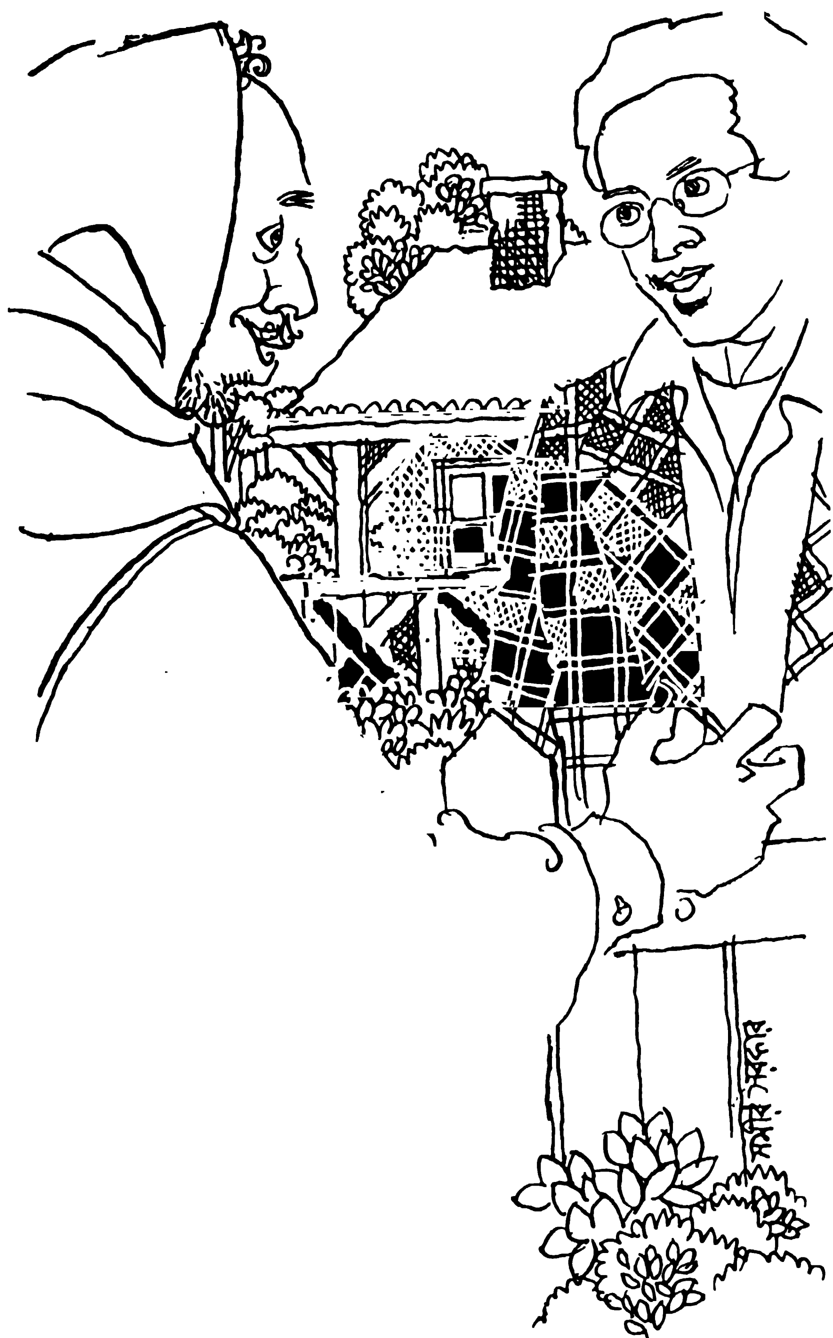
এতক্ষণে কর্নেলের মুখে কথা ফুটল,—সর্বনাশ! গোবিন্দ ওই অবস্থায় হয়তো পালাতে পারবে না। লোকগুলো ওকে খুন করে ফেলবে!

ততক্ষণে ধামসা-কাঁসির বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। আদিবাসী জনতা থমকে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ঘুরে নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করছে। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তাদের বললেন,—তোমরা বরং কেউ শিগগির থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। কী ঘটেছিল, সে-কথা আমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলব।

একজন বললো,—সার! গোবিন্দকে পুলিশ ধরবে না। আমি আজই দেখেছি, গোবিন্দ কেষ্টবাবুর গাড়িতে চেপে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। কেষ্টবাবুকে পুলিশ খুব খাতির করে।

এই সময় দৌড়ুতে দৌড়ুতে সুরেন এসে গেল। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো,—পথে আসতে আসতে সব শুনেছি সার! গোবিন্দ নাকি আপনাকে খুন করতে এসেছিল!

কর্নেল বললেন,—সুরেন! আমার এই নেমকার্ড নিয়ে এখনই তুমি রায়গড় থানায় চলে যাও। এখানে আসবার আগে আমি পুলিশের ডি আই জি অরবিন্দ মুখার্জিকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিলুম। উনি নিশ্চয় রায়গড় থানায় আমার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।



বলে তিনি বুকপকেট থেকে নেমকার্ড বের করে সুরেনকে দিলেন। সুরেন সবে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় জঙ্গল থেকে সেই সশস্ত্র লোকগুলি বেরিয়ে এল। তাদের একজন আদিবাসী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বললো। অমনই দেখলুম, চঞ্চল জনতা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বললুম,—কী ব্যাপার সুরেন?

সুরেন চাপা স্বরে বললো,—বাবা হাড়মটমটিয়া গোবিন্দকে মেরে ফেলেছে।

কর্নেল চমকে উঠলেন,—সে কী! ওদের একজনকে ডাকো তো সুরেন! ব্যাপারটা শুনি।

সুরেনের ডাকে লাঠি হাতে বলিষ্ঠ গড়নের এক যুবক এগিয়ে এসে আমাদের সেলাম ঠুকে ভয়ার্ত মুখে বললো,—সার! গোবিন্দ বেশিদূর যেতে পারে নি। বাবা হাড়মটমটিয়া উপেন দত্তের মতোই তার চেলা গোবিন্দের মাথার খুলি আর মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। চিত হয়ে পড়ে আছে গুণ্ডাটা।

তার এক সঙ্গী বললো,—শুনেছি, গোবিন্দ আপনাকে খুন করতে এসেছিল। আমাদের মনে হচ্ছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসবার সময় ঠাকুরবাবা তার পিছু নিয়েছিল। ঠাকুরবাবা পাপীদের শাস্তি দেন কি না, তাই—

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—সুরেন! তুমি এদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চলে যাও। পুলিশ তার সঙ্গে এসে গোবিন্দের অবস্থা দেখবে। শিগগির!

সুরেন সেই বলিষ্ঠ গড়নের যুবকটিকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত এগিয়ে গেল। আদিবাসী জনতা মুখ তাকাতাকি করে একে-একে চলে গেল। বুঝলুম, পুলিশকে তারা খুব ভয় করে। তা ছাড়া পাছে পুলিশ তাদেরকে গোবিন্দের খুনী বলে পাকড়াও করে, তাই তারা দ্রুত কেটে পড়ল।

জঙ্গলে যারা গোবিন্দকে ধরতে ঢুকেছিল, তারাও চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তোমরা চলে যেয়ো না। তোমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং হাতের লাঠি-কাটারিগুলো অন্যদের হাতে দিয়ে তোমরা কয়েকজন আমাদের সঙ্গে এস। গোবিন্দের লাশ আমি দেখতে চাই।

জনাতিনেক যুবক রাজি হল। অন্যেরা তাদের লাঠি-বল্লম-কাটারি নিয়ে বস্তির দিকে চলে গেল। শীতের সূর্য ততক্ষণে দূর দিগন্তে পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। কর্নেল আর আমার কাছে টর্চ ছিল। টর্চ বের করে ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতরে এখনই আঁধার ঘনিয়েছে। এলোমেলো বাতাসে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে গাছপালায়। ঝোপঝাড় এড়িয়ে উঁচু গাছের তলা দিয়ে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম উত্তরে।

কিছুক্ষণ পরে যুবকেরা পশ্চিমে ঘুরল। তারপর খানিকটা খোলা ঘাসে ঢাকা জমিতে পৌঁছুলুম। সেই জমিটার শেষপ্রান্তে যেতেই আচম্বিতে শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ শোনা গেল। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে করযোড়ে ঝুঁকে প্রণাম করার পর বুকে ক্রস আঁকল। বুঝলুম, খ্রিস্টান হলেও এরা পূর্বপুরুষের ধর্মে বিশ্বাস ছাড়েনি। কিন্তু ওই মট মট শব্দ কীসের? শব্দটা আমাদের সামনে জঙ্গলের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

ওরা এবার আঙুল বাড়িয়ে দুটো ঝোপের মধ্যিখানটা দেখাল। কর্নেল আর আমি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। এ বড় বীভৎস দৃশ্য।

গোবিন্দ পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় একটু কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথা থেকে বুক পর্যন্ত চাপ-চাপ টাটকা রক্ত এখনও গড়াচ্ছে। তার গায়ের সোয়েটার ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে। কর্নেল একটুখানি দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে সরে এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন,—আমারই দোষ, জয়ন্ত! কখনও কারও গায়ে এ পর্যন্ত আমি হাত তুলি নি। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অথবা সামরিক জীবনের কিছু কদর্য অভ্যাসবশে বেচারাকে আমি ঘুষি মেরেছিলুম। এখন আক্ষেপ হচ্ছে। এই হতভাগ্য যুবকটি আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি শুধু আত্মরক্ষা করে ওকে আটকে রাখতে পারতুম।

একজন আদিবাসী যুবক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললো,—সার! পাপী তার শাস্তি পেয়েছে। এজন্য আপনার কোনও দোষ নেই। প্রভু যীশু বলেছেন, পাপের বেতন মৃত্যু।

আর একজন কিছু বলতে যাচ্ছে, আচম্বিতে সেই অদ্ভুত গর্জন শোনা গেল। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

আদিবাসী যুবকেরা অমনি দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল রিভলভার বের করে ব্যস্তভাবে বললেন,—জয়ন্ত! তৈরি থাকো! চারদিকে লক্ষ্য রাখো! কিন্তু সাবধান! আলো জ্বেলো না।

আমার রিভলভার হাতে ছিল এবং অন্য হাতে টর্চ। চারদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখলুম। আজ সন্ধ্যায় গর্জনটা থামছে না। গর্জনটা কোন্‌দিক থেকে আসছে, বোঝাও যাচ্ছে না। চাপাস্বরে বললুম,—কর্নেল! কর্নেল! এক রাউন্ড ফায়ার করা যাক।

না। —বলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ টর্চের আলো ফেললেন। এক পলকের জন্য ভালুকের মতো কালো কী একটা জন্তুকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখলুম। ভালুকের মতো বলছি বটে; কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে, ওটা ভালুক নয়। শিম্পাঞ্জি কিংবা গরিলার মতো। কিন্তু এই জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি বা গরিলা থাকা তো অসম্ভব ব্যাপার।

তবে সেই গর্জনটা থেমে গেছে কর্নেল আলো জ্বালবার পরই। কাজেই ওই অদ্ভুত প্রাণীটাই যে গর্জন করছিল, তাতে ভুল নেই।

এই সময় আমাকে অবাক করে কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললুম,—কী ব্যাপার? হাসছেন কেন?

কর্নেল ঘাসে বসে চুরুট ধরিয়ে তারপর বললেন,—বসো! পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

আমিও বসলুম। তবে অস্বস্তিটা গেল না। বারবার কর্নেলকে প্রশ্ন করেও তাঁর হঠাৎ অট্টহাসির কোনও উত্তর পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে গাছপালার শীর্ষে চাঁদ দেখা গেল। বনভূমিতে জ্যোৎস্না ক্রমশ গা ছমছম করা অনুভূতির সঞ্চার করল। শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগল চারপাশের আলো-ছায়ায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সেই সাংঘাতিক অদ্ভুত প্রাণীটা যেন চারপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে-কোনও সময় অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগই দেবে না।

কতক্ষণ পরে আমরা যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে জোরালো আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। তারপর সুরেনের ডাক ভেসে এল,—কর্নেলসায়েব! কর্নেলসায়েব!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—সম্ভবত সুরেনের সঙ্গী জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

বলে তিনি টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত দিতে থাকলেন। তারপর জোরালো সার্চলাইটের আলো ফেলতে ফেলতে এসে গেল ওরা। একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলকে স্যালুট ঠুকে বললেন,—আপনার খবর আমরা পেয়েছিলুম। আপনি ফরেস্টবাংলোয় উঠেছেন, সে-খবরও পেয়েছি। যাই হোক, কোথায় গোবিন্দ ব্যাটাচ্ছেলের লাশ?

কর্নেল বললেন,—আপনিই কি অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ তপেশ সান্যাল?

—হ্যাঁ সার!

কর্নেল তাঁকে গোবিন্দের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখাতে নিয়ে গেলেন। একজন কনস্টেবল হ্যাসাগ এনেছিল। এতক্ষণে হ্যাসাগটা জ্বালতে ব্যস্ত হল সে। রীতিমতো সশস্ত্র একটি পুলিশবাহিনী এসেছে। সবাই গোবিন্দের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাসাগটা জ্বলে ওঠার পর কনস্টেবলটি মৃতদেহের কাছে রাখল। পুলিশ অফিসার ছিলেন আরও দুজন। তাঁরা সার্চলাইটের আলোয় কাছাকাছি ঝোপঝাড় খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। সুরেন এবং তার সঙ্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে গেলুম। তখন সুরেন চাপাস্বরে বললো,—এর নাম ছকুয়া। পিটার ছকুলাল মুর্মু। একে জিজ্ঞেস করুন, কী দেখেছিল?

ছকুয়া আস্তে বললো,—সার! আমি ঠাকুরবাবাকে একটুখানি দেখেছি।

বললুম,—কেমন চেহারা ঠাকুরবাবার?

ছকুয়া বললো,—কালো। দুই হাত মাটিতে ঠেকে যাবে, এমন লম্বা। বড়-বড় নখ সার! গোবিন্দকে মেরে হয়তো রক্ত খেত। আমাদের দেখেই ভ্যানিশ হয়ে গেল।

বুঝলুম, যুবকটি শিক্ষিত। তাকে জিজ্ঞেস করলুম,—তুমি কি আর কখনও ঠাকুরবাবাকে দেখেছ?

ছকুয়া বললো,—না সার! তবে একবার আমার বাবা লুকিয়ে এই জঙ্গলে গাছের ডাল কাটতে এসেছিল। বাবা গাছের ওপর থেকে দেখেছিল, ঝোপের আড়ালে ঠাকুরবাবা বসে আছে। আর কী আশ্চর্য সার, বাবা কেন মিথ্যা বলবে?

—আশ্চর্যটা কী?

ছকুয়া ফিসফিস করে বললো,—বাবা দেখেছিল, কেষ্টবাবু বন্দুক কাঁধে ঠাকুরবাবার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—সে কী! কেষ্টবাবুকে ঠাকুরবাবা মেরে ফেলেনি?

—সেটাই তো বাবা বুঝতে পারেনি। একটু পরে কেষ্টবাবু চলে গেল। তখন বাবা গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল। কথাটা বাবা কাকেও বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু আজ কথায়-কথায় সুরেনকে বলেছি। সুরেন বলল, কথাটা আপনাকে আর কর্নেলকে যেন বলি।

সুরেন বললো,—আমার মনে হচ্ছে, ওটা কোনও সাংঘাতিক জন্তু। কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু।

বললুম,—ঠিক বলেছ!

এইসময় দেখলুম, আবার জোরালো স্পটলাইট জ্বেলে কারা আসছে। সুরেন বললো,—হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচার নিয়ে আসছে ওরা। বডি তুলে নিয়ে যাবে। সঙ্গে আর্মড ফোর্সও আছে। ওই দেখুন।

কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দের মৃতদেহ স্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালের কর্মীরা আর সশস্ত্র পুলিশদলটি চলে যাওয়ার পর অফিসার-ইন-চার্জ তপেশ সান্যাল বললেন,—এখানে আর আমাদের কিছু করার নেই! চলুন কর্নেলসায়েব! আপনাকে আমি ফরেস্টবাংলোয় পৌঁছে দিয়ে থানায় ফিরব। আমাদের জিপ আর একটা ভ্যান রংলিডিহির কাছে দাঁড় করানো আছে।

কর্নেল এতক্ষণে আমার সঙ্গে মিঃ সান্যালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তপেশ সান্যাল নমস্কার করে হাসতে হাসতে বললেন,—আপনি সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আপনার কাগজে যা লেখার লিখবেন। তবে পর-পর দুটো একই ধরনের ঘটনা। এই ফরেস্টে সম্ভবত কোনও সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী আছে।

আমরা বনদফতর আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দফতরে ব্যাপারটা জানাব। প্রাণীটাকে ফাঁদ পেতে ধরা দরকার।

কথা বলতে বলতে যে দিক থেকে আমরা এসেছিলুম, সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। তারপর দক্ষিণে ঘুরে মিনিট দশেক হাঁটার পর সেই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় পৌঁছুলুম। সুরেন আমাদের সঙ্গ ধরল। ছকুয়া চলে গেল।

কর্নেল বললেন,—আমরা এবার বাংলোয় যেতে পারব। মিঃ সান্যাল! আপনাদের আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তবে যে কথাটা বলেছি, আশা করি সেই মতো কাজ হবে!

মিঃ সান্যাল বললেন,—নিশ্চয় হবে। আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য ডি আই জি সায়েবের কড়া নির্দেশ আছে। তা ছাড়া এই কেসে আমারও ব্যক্তিগত কৌতূহল তীব্র। আপনি আমার সেই কৌতূহল আরও তীব্র করে দিয়েছেন।

ফরেস্টবাংলোয় পৌঁছে দেখি, নাখুলাল টর্চ আর বল্লম হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল বললেন,—নাখুলাল! শিগগির কফি। আজ রাতে ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। সুরেন! তুমি তোমার জেঠুকে ঘটনাটা শুনিয়ে দিয়ো! তোমার জেঠুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ তো?

সুরেন হাসবার চেষ্টা করে মাতৃভাষায় নাখুলালকে কিছু বললো। তারপর দুজনে বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল। বারান্দায় হেরিকেন জ্বলছিল। কিন্তু বাইরে বেজায় হিম। কর্নেল দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকে চীনা লণ্ঠনটা জ্বাললেন। তারপর পিঠের কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রাখলেন। বাইনোকুলার আর ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন,—হতভাগা গোবিন্দের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এই যন্ত্রদুটোর হয়তো ক্ষতি করে ফেলেছি ভেবেছিলুম। কিন্তু নাঃ! দুটোই আস্ত আছে।

এই সময় ছকুয়ার মুখে শোনা তার বাবার হাড়মটমটিয়া এবং কেষ্ট অধিকারীদর্শনের ঘটনাটি বললুম। কিন্তু কর্নেলের মুখে কোনও বিস্ময়চিহ্ন ফুটে উঠল না। পা দুটো ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে মাথার টুপিটা খুলে তিনি শুধু বললেন,—মাদারিকা খেল!

জিজ্ঞেস করলুম,—তার মানে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। অন্যমনস্কভাবে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য এবার ভাবনা হচ্ছে জয়ন্ত! কেষ্ট অধিকারী এমন সাংঘাতিক লোক, কল্পনাও করিনি! অবশ্য হালদারমশাই ছদ্মবেশেই কেষ্টবাবুর দুর্গে ঢুকবেন। তা হলেও—

হঠাৎ থেমে তিনি দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু পরে সুরেন

ট্রেতে কফি আর দু'প্লেট স্ন্যাক্স নিয়ে এল। বললুম,—সুরেন! তুমি কর্নেলসায়েবকে ছকুয়ার বাবার ঘটনা বলো!

কর্নেল বললেন,—না সুরেন! জেঠুর কাছে গিয়ে চা বা কফি খেতে খেতে গল্প করো! জেঠুকে বলবে, আজ রাতে তুমি বাংলোতে খাবে এবং থাকবে।

সুরেন চুপচাপ চলে গেল। বুঝলুম, ছকুয়ার বাবার গল্পটা বলার ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু কর্নেল নিজেই আস্ত রহস্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, শিগগির আবার হয়তো কিছু ঘটবে।

কিন্তু সে-রাতে তেমন কিছু ঘটল না। রাত দশটা নাগাদ খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট টানতে টানতে চীনা লণ্ঠনের দম কমিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে বলেছিলেন। উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি আমাকে পুরু কম্বলের ভেতর যথেষ্ট আড়ষ্ট করেছিল। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুধু মুখটা বাইরে রেখেছিলুম। পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ। দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল। ঘুমের রেশ বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে যদি সেই বিকটদর্শন অদ্ভুত প্রাণীটা তার লম্বা হাতের ধারালো নখ দিয়ে আমাকে চিরে ফালা-ফালা করে ফেলে? তারপর একবার মুখ একটু ঘুরিয়ে দেখেছিলুম, কর্নেল তখনও চেয়ারে বসে আলোটা আড়াল করে টেবিলে ঝুঁকে কিছু করছেন। কিন্তু আমার দিকে তাঁর পিঠ। কী করছিলেন, দেখতে পাইনি।

ঘুম ভাঙল নাখুলালের ডাকে। সে বেড-টি দিতে এসেছিল। বাইরে কুয়াশামাখা নিষ্প্রভ রোদ। চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে দেখলুম, কর্নেলের বিছানা শূন্য। টেবিলে ওঁর কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা নেই। নাখুলাল বললো, —কর্নেলসায়েব সুরেনকে নিয়ে ভোরে বেরিয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা কেটে গেলে বাংলোর লনে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ছিলুম। রোজকার মতো মালী এসে ফুলবাগিচায় ঝারি থেকে জল দিচ্ছিল। এমন সময় দেখলুম, সুরেন নিচের রাস্তা থেকে হন্তদন্ত বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে।

সে গেট খুলে লনে ঢুকে বললো,—কর্নেলসায়েব আপনাকে ডেকেছেন। শিগগির রেডি হয়ে আসতে বলেছেন।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—উনি কোথায় আছেন?

সুরেন দম নিয়ে বললো,—ভোরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রায়রাজাদের দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে থানায় গিয়েছিলেন। তারপর উপেনবাবুর দাদা মাখনবাবুর বাড়িতে গেলেন। সেখানেই কর্নেলসায়েব আছেন।

শেষ কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, কাল বিকেলে আমাকে কর্নেল সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে মাখন দত্তের সঙ্গে দেখা করতে বলছিলেন। সেই সময় অতর্কিতে গোবিন্দ ছুরি হাতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দ্রুত তৈরি হয়ে বেরোলুম। জ্যাকেটের পকেটে রিপোর্টারস নোটবুক নিলুম। কাঁধে ঝোলানো কিটব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্রটাও নিতে হল। কারণ কর্নেল 'রেডি হয়ে' যেতে বলেছেন। এই কথাটায় সতর্কভাবে যাওয়ার সংকেত আছে।

সুরেন বললো,—জেঠুকে বলে আসি, আপনারা ব্রেকফাস্ট করবেন না। কর্নেলসায়েব বলে দিয়েছেন।

নাখুলাল গম্ভীর মুখে বাংলোর পিছনদিক থেকে আসছিল। সুরেন এবং তার মধ্যে নিজেদের ভাষায় কিছু কথা হল। তারপর সুরেন এসে বললো,—চলুন সার!

নিচের সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সুরেন একটু হেসে বললো,—জেঠু আমার জন্য খুব ভাবনায় পড়েছে। তার ভয়, বাবা হাড়মটমটিয়া এবার আমাকে মেরে রক্ত খাবেন।

বললুম,—তুমি ঠাকুরবাবা হাড়মটমটিয়া বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস করো না! তাই না?

সুরেন বললো,—বোগাস সার! রংলিডিহিতে শিবু নামে একজন ওঝা আছে। সে-ই সবার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিবুও নাকি ছকুয়ার বাবার মতো হাড়মটমটিয়াকে দেখেছে। শিবু বলে, বাবা হাড়মটমটিয়ার নামে মুর্গি বলি দেওয়ার রীতি সে এখনও চালু রেখেছে। ডোবার পাড়ে বাবার থান আছে। সেখানে মুর্গির রক্ত খাচ্ছিল বাবা। শিবু স্বচক্ষে দেখেছে। বাবাও নাকি তাকে দেখে একটা হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

সুরেন হেসে উঠল। বুঝলুম, এই তরুণটি যুক্তিবাদী। সে আমাকে রংলিডিহির দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে হাইওয়েতে নিয়ে গেল। এখানে একটা বাসস্টপ আর কয়েকটা চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান আছে। কয়েকটা সাইকেল রিকশ দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন তার চেনা একজন রিকশওয়ালাকে ডেকে বললো,—মাখন দত্তের বাড়ি চলো ঝাব্বুদা!

ঝাব্বু আমাকে দেখে নিয়ে বললো,—তিনটাকা লাগবে সুরেন!

সুরেন কিছু বলার আগেই আমি বললুম,—ঠিক আছে। শিগগির চলো!

হাইওয়ে এখান থেকে বাঁক নিয়ে রায়গড়ের পাশ দিয়ে গেছে। সামনে জোরালো শীতের হাওয়া। ঝাব্বুর তিনটাকা ভাড়ার বদলে দশটাকা দাবি করা উচিত ছিল। প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব পার হতে আধঘণ্টা লেগে গেল। রায়গড়ের মোড়ে বাঁক নিয়ে গলিরাস্তায় বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মাখনবাবুর জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে রিকশ দাঁড় করাল ঝাব্বু। তাকে একটা পাঁচটাকার নোট দিলে সে খুশিতে আমাকে সেলাম ঠুকল। এই আদিবাসীরা এখনও কী সরল!

উঁচু বারান্দায় সিমেন্টের চটা উঠে আছে। বারান্দায় সুরেন উঠে গিয়ে ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বললো,—ছোটসায়েব এসেছেন সার!

ভেতরে ঢুকে দেখলুম, কর্নেল একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা তক্তপোশে সতরঞ্জি পাতা। সেখানে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! আমি সার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ফ্যান। কাজেই আমি আপনাদের দুজনকেই চিনি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার কথা ভাবিনি। জয়ন্তবাবু! আপনি আমার পাশে বসুন। সুরেন! তুই এখানেই বস্ বাবা!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—জয়ন্ত! আশা করি, বুঝতে পারছ মাখনবাবু কী বলছেন?

মাখনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—উপেন আমার ছোটভাই বটে, কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করতুম। জানতুম সে শয়তান গোবিন্দকে নিয়ে কী সাংঘাতিক কাজ করছে। রাজবাড়িতে এখন তো কলেজ হয়েছে। তার আগে উপেন কত দামি-দামি জিনিস চুরি করে কলকাতায় বেচেছিল। সব জেনেও মুখ খোলার সাহস ছিল না। আমাকে দাদা বলেও সে রেহাই দিত না!

কর্নেল বললেন,—আপনার সাহায্য খুবই জরুরি মাখনবাবু! রাজবাড়ির সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

মাখনবাবু তাঁর কথার ওপর বললেন,—ওটা কুমুদের বোকামি! বোকামি কিংবা লোভ। এখন স্বীকার করা উচিত ছিল ওর। অথচ এখনও আপনাদের কথাটা জায়ায়নি। কেন দীপুকে উপেন কিডন্যাপ করেছিল, কুমুদ জানত না? দীপু সরল ছেলে। রাজবাড়ির ওই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তার বাবা তাকে দেখিয়েছিল। দীপু কথায়-কথায় তার বন্ধুদের বলে ফেলেছিল। সেই কথা উপেনের কানে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। এখন কুমুদ আমার সামনে সত্যি কথাটা বলুক। সে ভটচায। বামুনের ছেলে। পৈতে ছুঁয়ে বলুক, পাণ্ডুলিপিটা সে উপেনকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বেচেছিল কি না?

অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল বললেন,—যাক্‌গে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওটা আপনি উপেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে যেভাবে হোক, উদ্ধার করে দিন।

মাখনবাবু বললেন,—জয়ন্তবাবুর জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি গিয়ে দেখি, উপেনের বউ রমা আছে নাকি।

মাখনবাবু ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। একটি বালিকা আমাকে চা দিয়ে গেল। কর্নেলকে এবার গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি আস্তে বললেন,—আজ ভোরে ও.সি মিঃ সান্যাল উপেনের ঘর সার্চ করে গেছেন। কিন্তু ওটা

পাননি। মাখনবাবু বলছিলেন, কাল সকালে কেষ্টবাবু—মিঃ অধিকারী এ পাড়ায় এসেছিলেন। কুমুদবাবুর বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তো তিনি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই এসেছিলেন। আমার ধারণা ছিল পাণ্ডুলিপিটা কেষ্টবাবু হাতিয়েছেন। কিন্তু মাখনবাবু একটু আগে বললেন, তাঁর ভ্রাতৃবধূ গতরাতে একটা স্যুটকেস তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখতে দিয়ে গেছে। তবে তালার চাবি রমার কাছে আছে। তাই উনি তার কাছে গেলেন।

অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পর মাখনবাবু ফিরে এসে রুষ্টমুখে বললেন,—বজ্জাত মেয়ে! উপেনের দোসর তো? কর্নেলসায়েব এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন সে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে গেছে। আমার বড় মেয়ে সুতপা বলল, কাকিমা মিনিটপাঁচেক আগে বাপের বাড়ি যাচ্ছে বলে গেল। সুরেন! সায়েবদের নিয়ে এক্ষুনি বাসস্টপে যাও। ওকে পেয়ে যাবে।

## ॥ নয় ॥

সুরেন বেরুতে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—বসো সুরেন! খামোকা ছুটোছুটি করে লাভ নেই।

মাখনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কী বলছেন কর্নেলসায়েব! রমা স্যুটকেশ নিয়ে উধাও হয়ে গেলে আর কোনোদিন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করাই যাবে না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আপনি চিন্তা করবেন না মাখনবাবু! আপনাদের বাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলুম পুলিশকে। না—পোশাকপরা পুলিশ নয়। সাদা পোশাকে ছদ্মবেশে তারা ওত পেতে আছে পালাক্রমে। এতক্ষণ আপনার ভ্রাতৃবধূকে স্যুটকেসসহ পুলিশ পাকড়াও করে ফেলেছে।

মাখনবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন,—বাঃ! এ একটা কাজের মতো কাজ করেছেন আপনি।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আপনাকে একটা অনুরোধ, মাখনবাবু!

—বলুন! বলুন!

—আপনার ভাই উপেন দত্তের ঘরটা তো তালাবন্ধ।

—হ্যাঁ। তবে আপনি বললে তালা খোলার চেষ্টা করতে পারি। বাজারে নানকু নামে একটা লোক আছে। সে তালার চাবি তৈরি করে দিতে পারে। দৈবাৎ চাবি হারিয়ে গেলে নানকুর ডাক পড়ে। সুরেন তাকে চেনে।

কর্নেল বললেন,—সুরেন! তুমি নানকুকে ডেকে আনো শিগগির!

সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপরই মাখনবাবুর মেয়ে তপতী ভেতরের

দরজায় উঁকি মেরে বললো,—বাবা! অরুদা এসে কাকিমার কথা জিজ্ঞেস করছে। কী বলব!

মাখনবাবু বললেন,—ওকে বসতে বল্। যাচ্ছি।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—অরু কে?

আজ্ঞে, আমার ভাগনে। —বলে মাখনবাবু কণ্ঠস্বর চাপলেন ঃ ভাগনে বলে অরুণের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। উপেন ওকে নষ্ট করেছিল। অরুণ গোবিন্দের জুটি।

আমার মনে পড়ে গেল, হালদারমশাই গোবিন্দ আর উপেন দত্তের ভাগনেকে ফলো করে এসেছেন কলকাতা থেকে। বললুম,—কর্নেল! এই অরুণই গোবিন্দের সঙ্গে কলকাতা থেকে উপেনবাবুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

মাখনবাবু বললেন,—বরং অরুকে এখানে ডাকি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—থাক। আপনি গিয়ে দেখুন সে কী বলছে। তারপর দরকার মনে করলে এখানে ডেকে আনবেন।

—খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছে অরু। তার মানে, পুলিশের ভয়ে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলে মাখনবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। কর্নেলের চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য দুর্ভাবনায় আছি। থানায় টেলিফোন করে আমাকে তাঁর খবর দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু কুমারবাহাদুরকে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।

বললুম,—পাণ্ডুলিপিসহ রমা দত্তকে পুলিশ এতক্ষণ নিশ্চয় ধরে ফেলেছে।

এইসময় বাড়ির ভেতরে মাখনবাবুর চড়া গলায় কথাবার্তা শোনা গেল,—ছোটমামির হয়ে তুই ঝগড়া করতে এসেছিস? তোর লজ্জা করে না হতভাগা! তোর ছোটমামিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তো আমি কী করব? আরে! ও কী করছিস তুই? উপেনের ঘর খুলছিস কেন? চাবি কোথায় পেলি? অরু! ঘর খুলবিনে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। উঠোনের মাঝখানে একটা ইঁদারা। তার ওধারে একটা একতলা নতুন বাড়ি। দোতলা করার জন্য লোহার শিক উঁচু হয়ে আছে ইতস্তত। মধ্যিখানে খোলা সিঁড়িতে পলেস্তারা এখনও পড়েনি। একটা ঘরে তালা খুলছে বলিষ্ঠ চেহারার একজন যুবক। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় ফিল্মহিরোদের স্টাইলে ছাঁটা চুল। গায়ে নীল টিশার্ট, পরনে জিনস। সে শেষ তালাটা খুলেছে, তখনই কর্নেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

সে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলকে দেখে বললো,—কাঁধ ছাড়ুন বলছি।

কর্নেল তার কাঁধে আরও চাপ দিয়ে একটু হেসে বললেন,—তোমার ছোটমামার ঘরের চাবি তুমি কোথায় পেলে?

অরুণ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। বললো,—বড়মামা! তুমি জানো এই ভদ্রলোক কে?

বাড়ি একেবারে স্তব্ধ। মাখনবাবুর স্ত্রী, মেয়ে আর দুই ছেলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাখনবাবু গর্জে উঠলেন,—উনি তোর যম। হতচ্ছাড়া বাঁদর! তোর এত সাহস উপেনের ঘরে ঢুকতে চাস? শিগ্‌গির বল্‌ কে তোকে চাবি দিল?

অরুণ খেঁকিয়ে উঠল,—তুমি ভেবেছ, ছোটমামা মরে গেছে বলে মিথ্যামিথ্যি ছোটমামিকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে এই বাড়ি দখল করবে?

কর্নেল বললেন,—তুমি ঘরে ঢুকছ কেন অরুণ?

অরুণ বললো,—ছোটমামি আমাকে তার ঘরে থাকতে বলেছে। আমি বাড়ি পাহারা দেব। আপনি জানেন না স্যার, বড়মামা ছোটমামার বাড়ি দখল করে ছোটমামিকে তাড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন,—ঠিক আছে। তোমার ছোটমামি যখন তোমাকে চাবি দিয়েছে, তখন তুমি তার ঘরের মালিক। মাখনবাবু! আপনি অরুণকে বাধা দেবেন না।

বলে কর্নেল একটু সরে দাঁড়ালেন। অরুণ শেষ তালাটা খুলে ঘরে ঢুকল। আমি ততক্ষণে বারান্দায় উঠে কর্নেলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। লক্ষ্য করলুম, অরুণ খাটের ম্যাট্রেসের তলা থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করল। কর্নেল চুরুট কামড়ে ধরে বললেন,—চলো জয়ন্ত! এঁদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের নাক না গলানোই উচিত।

সেই সময় প্যাকেটটা বগলদাবা করে অরুণ বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করছিল। আচম্বিতে কর্নেল তার বগলের ফাঁক থেকে প্যাকেটটা টেনে নিলেন। তারপরই দেখলুম, অরুণের হাতে একটা ছুরি ঝকমক করে উঠেছে। মাখনবাবু বোবাধরা গলায় শুধু বলে উঠলেন,—এই! এই!

কর্নেল তৈরিই ছিলেন। গোবিন্দকে ধরাশায়ী করার পদ্ধতিতে অরুণের পেটে লাথি ঝাড়তেই সে ককিয়ে উঠে বারান্দায় পড়ে গেল। কর্নেল যথারীতি তার দিকে রিভলভার তাক করলেন। এবার আমি কাল বিকেলের মতো হতবুদ্ধি হয়ে যাইনি। অরুণের ছুরিটা ছিটকে পড়েছিল। দ্রুত কুড়িয়ে নিলুম। অরুণ কুঁকড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছিল। কর্নেলের লাথিটা জোরালো ছিল। প্যাকেটটা আমাকে

দিয়ে অরুণের চুল ধরে কর্নেল তাকে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে ঘরের ভেতর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। চাবির গোছা চৌকাঠের কাছে পড়ে ছিল। কর্নেল দরজা বন্ধ করে তিনটে তালা এঁটে নেমে এলেন। বললেন,—মাখনবাবু! আপনার ভাগনের জন্য চিন্তা করবেন না। আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে বলছি। আপনি এবং আপনার বাড়ির সবাই যা দেখেছেন, পুলিশকে আশা করি তা-ই বলবেন।

মাখনবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমেছি, সুরেনকে হন্তদন্ত আসতে দেখলুম। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো,—নানকুর আসতে একটু দেরি হবে।

কর্নেল বললেন,—নানকুর দরকার আর হবে না সুরেন! আমরা থানায় যাচ্ছি। তুমি বনবাংলোয় চলে যাও। তোমার খুড়ো খুব ভয় পেয়েছে। তোমাকে দেখলে সে সাহস পাবে।

বড়রাস্তায় গিয়ে কর্নেল একটা সাইকেলরিকশ ডাকলেন। বললেন,—থানায় যাব।

রিকশ চলতে শুরু করলে কর্নেল প্যাকেটটার টেপ উপড়ে খুলে ফেললেন। তারপর কয়েকটা স্তর কাগজের মোড়ক খুলে একটা দিক দেখে নিলেন। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটতে দেখলুম। আমিও দেখে ফেলেছি জিনিসটা কী। সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। মেটে রঙের তুলোট কাগজে নাগরী লিপিতে লেখা 'কুলকারিকা'। বাকিটুকু পড়ার আগেই কর্নেল আগের মতো মোড়ক এঁটে তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগের চেন খুলে পাণ্ডুলিপিটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

বললুম,—তা হলে অরুণের ছোটমামির স্যুটকেসে পুলিশ কিছু পাবে না।

—কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছু। বোঝা যাচ্ছে, এই মোড়কে কী আছে রমা জানত না। অরুণ তাকে বলেনি। তবে আমার অবাক লাগছে, রাত্রে পুলিশ রমার বাড়ি সার্চ করে এটা দেখতে পায়নি কেন? একটা সম্ভাবনা, জিনিসটা অরুণের কাছেই ছিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সে চুপিচুপি ও বাড়িতে ঢুকে এটা খাটের ম্যাট্রেসের তলায় রেখেছিল। তখন মাখনবাবুরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণে অরুণ ঝুঁকি নিয়ে এটা নিতে এসেছিল। কেষ্ট অধিকারী তাঁর কোনও লোককে সম্ভবত অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে গিয়েছিলেন।

সায় দিয়ে বললুম,—এটা ছাড়া আর কোনও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

ও.সি তপেশ সান্যাল কর্নেলের অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা করে

আমাদের বসালেন। তারপর একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে ডেকে কফি আনতে হুকুম দিলেন। বললেন,—উপেন দত্তের স্ত্রীকে বাসস্টপে যাওয়ার পথে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার স্যুটকেসে কাপড়চোপড়ের তলায় দুটো হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। আনুমানিক দাম আড়াই লাখ টাকা। আর একটা অষ্টধাতুর বিগ্রহ পাওয়া গেছে। বিগ্রহ কোন্ দেবতার, তা বুঝতে পারলুম না। ঠিক এইরকম বিগ্রহ সোনাডিহির জমিদার বাড়ি থেকে দু'বছর আগে চুরি গিয়েছিল। ওঁরা যে ফটো দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সোনাডিহিতে খবর দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—উপেন দত্তের ভাগনে অরুণকে আপনারা খুঁজছিলেন। এইমাত্র উপেন দত্তের ঘরের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দিয়েছি। এই চাবি নিয়ে এখনই কোনও অফিসারকে পাঠিয়ে দিন। এই ছোকরা ঠিক গোবিন্দের মতোই হঠাৎ ছুরি বের করে আমাকে স্ট্যাব করতে চেয়েছিল। উপেন দত্তের দাদা মাখনবাবু সপরিবারে ঘটনাটা দেখেছেন।

তপেশবাবু তখনই একজন সাব-ইন্সপেক্টারকে ডেকে চাবির গোছা দিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। তিনি তখনই বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—মিঃ হালদারের কথা আপনাকে বলেছিলুম। তাঁর—

—হ্যাঁ। মিঃ হালদার আসানসোল থেকে রিং করেছিলেন আধঘণ্টা আগে। তিনি আপনাকে জানাতে বললেন, তাঁকে কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। কেষ্ট অধিকারীর বন্ধু একই ট্রেনে কলকাতা ফিরছেন। রাতের দিকে মিঃ হালদার থানায় রিং করবেন। সম্ভব না হলে কাল মর্নিংয়ে।

এইসময় কফি আর বিস্কুট আনল একটি ছেলে। বুঝলুম, থানার পাশেই চা-কফির দোকান আছে। আমার কফি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তপেশবাবুর অনুরোধে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেল কফি পেলে খুশি হন। কফি খেতে খেতে তিনি বললেন,—বিকেল দুটোয় কি আপনি ফ্রি আছেন?

তপেশবাবু হাসলেন,—আমি কোনও সময়ই ফ্রি নয়। তবে আপনার জন্য ফ্রি হতে পারি।

—আপনি সঙ্গে একজন এস আই এবং দুজন আর্মড কনস্টেবল নেবেন। একটা স্পট লাইটও চাই।

—একটু হিন্ট্ দেবেন নি?

কর্নেল হাসলেন,—মোটামুটি একটা অ্যাডভেঞ্চার। কাজেই আপনার সঙ্গীদের আপনি বেছে নেবেন। তাঁরা যেন দক্ষ এবং সাহসী হয়। হ্যাঁ—মাখনবাবু বলছিলেন, রায়গড়ে বাঁকা নামে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সে মারা যায় বলে রটেছিল। কিন্তু এই থানার তৎকালীন ও.সি জনৈক

মিঃ ভাদুড়ি তাকে লোহাপুরে একটা পাহাড়ের চাতালে দেখতে পেয়েছিলেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাকে আর খুঁজে বের করতে পারেননি তিনি।

তপেশবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন,—হ্যাঁ, বাঁকা। তার একটা কেস ফাইল আমি দেখেছি। বিহারের পুলিশও তার খোঁজে ব্যস্ত। মিঃ প্রশান্ত ভাদুড়ির রিপোর্ট আমি পড়েছি। বাঁকা ডাকাতের একটা পায়ে গুলি লেগেছিল। তাকে খুঁড়িয়ে হাটতে দেখেছিলেন প্রশান্তবাবু!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—যাই হোক, অরুণের বিরুদ্ধেও আমি একটা এফ.আই.আর. করে রাখতে চাই।

—অবশ্যই। আপনি নিজেই লিখে দিন। বলে তপেশবাবু একশিট কাগজ দিলেন।

কর্নেল পকেট থেকে কলম বের করে দ্রুত অরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে তপেশবাবুকে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মনে রাখবেন বেলা দুটো। আমি বনবাংলোয় অপেক্ষা করব।

বেরিয়ে এসে সাইকেল-রিকশতে চেপে হাইওয়ে দিয়ে রংলিডিহির মোড়ে পৌঁছুতে এবার মাত্র আধঘণ্টা লাগল। কারণ আমরা দক্ষিণে উত্তাল শীতের হাওয়ার গতিপথে যাচ্ছিলুম। রিকশভাড়া মিটিয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে এবড়ো খেবড়ো জঙ্গলের দক্ষিণ সীমানার সেই পথটা এবং তিনদিক দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন।

বাংলোর সামনে সুরেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে হাসল। বললো,—আমার খুড়ো খুব মনমরা হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—আবার ভালুক দেখেছে, না হাড়-মটমট-করা শব্দ শুনেছে নাখুলাল?

নাখুলাল বাংলোর পিছন থেকে আসছিল। কথাটা শুনতে পেয়েছিল সে। সেলাম করে বিমর্ষ মুখে হেসে সে বললো,—সুরেনের কানে কিছু ঢোকে না। লেখাপড়া শিখে তার কান বদলে গেছে। স্যার! আমি দু'বার বাংলোর উত্তরদিকে নিচের জঙ্গলে ঠাকুরবাবার চলাফেরার শব্দ শুনেছি।

বলে সে অভ্যাস মতো বুকে ও কপালে ক্রস আঁকল। কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—তুমি ভয় পেয়ো না নাখুলাল! বল্লম তুলে চেঁচিয়ে বলবে, শিগ্‌গির তোমার হাড়-মটমট শব্দটা থেমে যাবে ঠাকুরবাবা! শিবু ওঝা তার গুরুকে ডাকতে গেছে।

সুরেন হেসে গড়িয়ে পড়ল। নাখুলাল বললো,—লাঞ্চ রেডি স্যার! স্নান করবেন তো করুন। গরম জল চাপিয়ে রেখেছি।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত স্নান করবে। আমার স্নানের দিন আগামী কাল।

ঘরে ঢুকে আস্তে বললুম,—আপনি অরুণের কাছ থেকে একটা প্যাকেট ছিনতাই করেছেন। অরুণ বা মাখনবাবু পুলিশকে তা বলবেন।

কর্নেল কপট চোখ কটমটিয়ে বললেন,—স্নান করে ফেলো। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। একটায় লাঞ্চ করব। দুটোয় তপেশবাবু আসবেন।

স্নানাহারের পর অভ্যাস মতো আমি বিছানায় গড়াচ্ছিলুম। কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট টানছিলেন। একটু পরে সুরেনকে দেখলুম। সে লনের রোদে ঘাসের ওপর বসল। তার একটু পরে কানে এল, কর্নেল তাকে বলছেন,—গর্তটা তুমি দেখেছিলে। অন্য কাকেও কি বলেছিলে?

সুরেন বললো,—দীপুকে বলেছিলুম। দীপু আর কাকেও বলতে আমাকে বারণ করেছিল।

—তুমি বা দীপু কেউ কি ওখানে ঢুকেছিলে?

—দুজনে একদিন ঢুকতে যাচ্ছিলুম। ভেতর থেকে চাপা গর্জন শুনে দুজনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। রায়রাজাদের দুর্গ তো জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেবার কলকাতা থেকে সরকারি লোকেরা এসে জঙ্গল সাফ করেছিল। কিন্তু ওদিকটা সাফ হয়নি। খোঁড়াও হয়নি। দীপু বলেছিল, সরকার আর টাকা দিচ্ছে না। তাই খোঁড়ার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। ও.সি. তপেশবাবু দুটো নাগাদ আসবেন। আমরা বেরুব। তুমি সঙ্গে থাকবে।

ভাতঘুমে আমার চোখ বুজে এসেছিল। এই বাংলোতে ঠাণ্ডাটা জঘন্য। দিনের বেলাতেও দুটো কম্বল মুড়ি দিতে হয়। কিন্তু সবে কম্বলের মধ্যে ওম সঞ্চারিত হয়েছে এবং আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—সহসা কর্নেল কম্বল দুটো তুলে ডাক দিলেন,—জয়ন্ত! আর নয়। উঠে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে হল। লনে ও.সি. তপেশ সান্যাল, আর একজন অফিসার এবং দুজন তাগড়াই চেহারার আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলও তৈরি হয়েছেন দেখলুম। তখনই বাথরুমে ঢুকে মুখে ঠাণ্ডা হিম জলের ঝাপটা দিলুম। তারপর পোশাক বদলে প্যান্টের পকেটে আমার খুদে আগ্নেয়াস্ত্রটি ভরে বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, পুলিশের জিপগাড়ি বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে আছে। জিপে এতগুলো লোক কীভাবে যাবে, বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে আমাদের উল্টোদিকে বাংলোর উত্তরের ছোট্ট গেটে পায়ে হেঁটে যেতে হল। নাখুলাল গেটের তালা খুলে দিল। কর্নেল তাকে বললেন,—গেট খোলা থাক। আমরা এখনই ফিরে আসছি।

বাংলোর নিচের জঙ্গলে নেমে কিছুটা চলার পর কর্নেল বাঁদিকে পশ্চিমে

ঘুরলেন। দুর্গম ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল আবার ডাইনে উত্তরে ঘুরলেন। তারপর ইসারায় সুরেনকে ডাকলেন। সুরেনের হাতে একটা জঙ্গলকাটা লম্বা দা ছিল। সে আস্তে বলল,—পাথরের স্ল্যাবগুলো আর একটু নিচে, স্যার!

পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘন দুর্গম জঙ্গল। সুরেন দা-এর আঘাতে সামনের একটা ঝোপ কেটে ফেলল। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম পাথরের ঘরের একটা ধ্বংসাবশেষ। শেষপ্রান্তে কুয়োর মতো একটা গর্তের মুখে লতাপাতা ঝালরের মতো ঝুঁকে আছে। গর্তটা নিখুঁত চতুষ্কোণ। ওপরে একটা চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা গাছ গর্তে বৃষ্টি ঢুকতে দেয় না।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আপনি আর একজন আর্মড কনস্টেবল এই গর্তের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্লিজ! যেন গুলি ছুড়বেন না। আপনারা ঝোপের আড়ালে এমনভাবে বসবেন, যেন গর্ত দিয়ে কেউ বেরুলে আপনাদের না দেখতে পায়। বাকিটা আপনাদের দক্ষতা আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। আমরা তাহলে আসছি। যথাসময়ে দেখা হবে। সুরেন! এস।

ও.সি তপেশবাবু, একজন আর্মড কনস্টেবল, কর্নেল, সুরেন এবং আমি আবার বাংলোয় ফিরে গেলুম। তারপর বাংলোর সদর গেট দিয়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিম-উত্তর দিকে কোণাকুণি এগিয়ে চললুম। এদিকে রুক্ষ শক্ত মাটিতে ছোট-বড় নানা গড়নের কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। কদাচিৎ একটা করে বিস্তীর্ণ ঝোপ। কর্নেল মাঝেমাঝে বাইনোকুলারে সম্ভবত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে নদী দেখলুম। নদীর বুকে পাথরে সাবধানে পা রেখে ওপরে গেলুম।

তারপর আমরা দুর্গের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে সুরেনের নির্দেশে ডানদিকে হাঁটতে থাকলুম। শীতের রোদ বিকেলে নিষ্প্রভ এবং দূরে কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। এ বেলা হাওয়া তত উত্তাল নয়। একটু পরে দেখলুম, দুর্গের পূর্ব দিকে অসংখ্য স্তূপ ঘিরে জঙ্গল গজিয়ে আছে। পা বাড়াতে হচ্ছে সাবধানে। সর্বত্র পাথরের স্ল্যাব এবং তার ফাঁকে গাছপালা গজিয়ে আছে। একখানে গিয়ে সুরেন একটা স্তূপ দেখাল।

এই স্তূপটা একটা ছোট্ট ঘরের ধ্বংসাবশেষ। ছাদের একটা অংশ টিকে আছে। ছাদের ওপর থেকে ঘন লতাপাতা নেমে এসেছে। কর্নেল ইসারায় তপেশবাবুকে ডেকে কী একটা দেখালেন। উঁকি মেরে দেখলুম, লতাপাতার নিচে কাশঝোপের ওপর কয়েকটা কালো লোম। এরকম লোম কর্নেলের সঙ্গে এসে একটা গুহার মতো জায়গায় দেখেছিলুম।

তপেশবাবু কাশঝোপের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—জন্তুটার পায়ের চাপে কাশঝোপের মাঝখানটা বেঁকে গেছে।

কর্নেল ঠিকই বলেন, 'জয়ন্ত! তুমি বোঝো সবই। তবে বড্ড দেরিতে।' আজ বিকেলের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হল আমার কাছে। কিন্তু অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—আর কোনও কথা নয়। আপনারা সবাই সশস্ত্র। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যা কিছু ঘটুক, গুলি ছুড়বেন না। স্পটলাইটটা আমাকে দিন। আমি আগে নামব। আমার পাশে তপেশবাবু থাকবেন। পিছনে কনস্টেবল নরসিংহ আর জয়ন্ত। সবার পিছনে সুরেন। জয়ন্ত! তোমার আর্মস বের করো। কিন্তু গুলি ছুড়বে না।

লতাপাতার ঝালর সরিয়ে দিলেন কর্নেল। দেখলুম, প্রায় ছফুট উঁচু এবং ফুট চারেক চওড়া একটা চতুষ্কোণ পাথরের দরজা। কিন্তু কপাট নেই। কর্নেল একটু থেমে খুব চাপাস্বরে বললেন,—কত ফুট নামতে হবে জানি না। এই সুড়ঙ্গ পথটা নদীর তলা দিয়ে গেছে।

তপেশবাবু আস্তে বললেন,—আমার অনুমান, অন্তত তিরিশফুট নামতে হবে। সিঁড়ি কিছুটা খাড়া হতে পারে।

কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন,—হ্যাঁ। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে সিঁড়ি। সাবধান! যেন পা স্লিপ করে না কারও। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমরা খুব আস্তে সুস্থে আর যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামব। একটানা আলো জ্বালব না। দুপাশে দেওয়ালে একটা হাত রেখে নামতে হবে। পাশাপাশি দুজন।

আমি বুঝতে পারছিলুম না কেন কর্নেল বারবার গুলি ছুড়তে নিষেধ করছে। সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীটার নখ যে তীক্ষ্ণ, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আক্রমণ করলেও কি চুপ করে থাকতে হবে?

কর্নেল ও তপেশবাবু নামবার মুখে পিছু ফিরে সুরেনকে দেখে নিলেন। সে ধারালো লম্বা দা হাতে নিয়ে নির্বিকার মুখে এগিয়ে এল। কর্নেল একবার স্পটলাইট ফেলে নিচের ধাপগুলো দেখে নিয়ে শুধু বললেন,—বাঃ!

মসৃণ এবং ফুটখানেক চওড়া কালো পাথরের সিঁড়ি একঝলক দেখে নিয়ে আবার গা শিউরে উঠল। কুয়োর মধ্যে নামলে হয়তো মানুষের এমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। তারপর নামছি তো নামছি। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, সুড়ঙ্গটা ধসে যাবে না তো?

গুনে গুনে চল্লিশটা ধাপ নামার পর কর্নেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্পটলাইটটা আবার জ্বাললেন। এবার সমতল মসৃণ পাথরের পথ। তারপর কর্নেল আবার স্পটলাইট জ্বাললেন। চোখে পড়ল দেওয়াল ঘেঁসে কয়েকটা কাঠের পেটি সাজানো। তপেশবাবু ফিসফিস করে বললেন,—এ কার গোডাউন?

তারপরই কানে তালা ধরে গেল বিকট সেই গর্জনে—আঁ—আঁ—আঁ —আঁ!

## ॥ দশ ॥

সেই গভীর সুড়ঙ্গের অমানুষিক ভয়ঙ্কর গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু তারপরই গর্জনটা থেমে গেল। স্পটলাইটের আলো ফেলেছিলেন সামনের দিকে। জন্তুটা শিম্পাঞ্জিই হোক, কিংবা আদিবাসীদের 'ঠাকুরবাবা' হাড়মটমটিয়া হোক, তীব্র আলোর নাগাল থেকে সম্ভবত দূরে সরে গেল।

কর্নেল স্পটলাইট নিভিয়ে দিলে ও.সি তপেশবাবু টর্চ জ্বাললেন। তারপর তিনি সুড়ঙ্গপথে বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁসে রাখা থাক-বন্দি পেটিগুলো পরীক্ষা করে চাপাস্বরে বললেন,—চোরাই মাল তো বটেই! কিন্তু এগুলো ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে গেলে সেই সুযোগে স্মাগলাররা সব লোপাট করতে পারে।

কর্নেল প্লাইউডের পেটিগুলোতে চোখ বুলিয়ে বললেন,—তপেশবাবু! আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলোতে সুইডেনের একটা কম্পানির নাম ছাপা আছে।

বলেন কী! —বলে তপেশবাবু উপরের একটা পেটি নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

কর্নেল সামনে স্পটলাইটের আলো আর একবার ফেলে বললেন,—বাবা হাড়মটমটিয়া এদিকে আর আসবে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ওই প্রাণীটা আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় পায়। বরং ঝটপট একটা কাজ করা যাক। সুরেনের দা-এর সাহায্যে একটা পেটি খুলে দেখা যাক, ওতে কী আছে! জয়ন্ত! তুমি স্পটলাইটটা নাও। মাঝেমাঝে জ্বেলে সামনে আর পিছনে আলো ফেলবে।

তপেশবাবু বললেন,—ঠিক বলেছেন! এমন হতেই পারে, স্মাগলারদের লোক আড়ি পেতে আমাদের এই সুড়ঙ্গে নামতে দেখেছে।

কর্নেল ততক্ষণে উপরের পেটিটা নামিয়ে ফেলেছেন। তপেশবাবুর কথাটা শুনে আমার আতঙ্ক বেড়ে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরে কেষ্ট অধিকারীর দল বন্দুক পিস্তল নিয়ে আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করলে প্রাণে বাঁচার চান্স নেই। ওই প্রাগৈতিহাসিক ভয়ঙ্গর জন্তুটার চেয়ে স্মাগলাররা আরও বিপজ্জনক।

সুরেনের দা-এর সাহায্যে পেটির একটা দিক খুলে দিতেই কর্নেল বললেন,—যন্ত্রাংশে ভর্তি।

তপেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—যন্ত্রাংশ? কী যন্ত্র?

কর্নেল বললেন,—আমার অনুমান এগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের টুকরো। পার্টগুলো জোড়া দিলে বোঝা যাবে অটোমেটিক রাইফেল কিংবা আরও সাংঘাতিক কোনও অস্ত্র।

কী সর্বনাশ! —তপেশবাবু চমকে উঠে বললেন : কর্নেল! তা হলে আগে

এই পেটিগুলো সিজ করে থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। জন্তুটার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! ওই জন্তুটাই এগুলো পাহারা দেয় বলে আমার ধারণা। জন্তুটা সম্পর্কে এলাকায় গুজব রটে গেছে। তা ছাড়া লোকেরা ধরেই নিয়েছে, দীপু জন্তুটার পেটে গেছে। তারপর উপেন দত্তও তার আক্রমণে মারা পড়েছে। তাই স্মাগলারচক্র বলুন কিংবা কেষ্ট অধিকারীর দল বলুন, ওরা নিশ্চিত যে কারও সাহস হবে না এই গোপন সুড়ঙ্গে ঢোকে!

সুড়ঙ্গের ভিতরে চাপাস্বরে এইসব কথাবার্তাও ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল। হঠাৎ সুরেন বললো,—সার! আমি আর এই কনস্টেবলদাদা দুজনে মিলে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বরং ওত পেতে বসে থাকব। কেউ এলেই তার ঠ্যাঙে দায়ের কোপ মারব।

এমন সাংঘাতিক একটা অবস্থায় কর্নেল হেসে ফেললেন,—তুমি বুদ্ধিমান সুরেন! সুড়ঙ্গের মুখে ওত পেতে থাকলে একজন লোক একশোজন শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তপেশবাবু! আপনি কনস্টেবল নরসিংহকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নির্দেশ দিন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে প্রথমে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আততায়ীদের তাড়িয়ে দিতে বা পায়ে গুলি করতে পারবে।

তপেশবাবুর নির্দেশ পেয়ে নরসিংহ এবং সুরেন এগিয়ে গেল। যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, সেই সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে ওরা অদৃশ্য হল। কর্নেল বললেন,—চলুন! এবার আমরা এগিয়ে যাই।

কর্নেল সামনে, তাঁর বাঁদিকে তপেশবাবু এবং ডানদিকে পিছনে আমি। তিনজনের হাতেই গুলিভরা রিভলভার। কর্নেল স্পটলাইটের আলো মধ্যেমধ্যে জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছিলেন। পায়ের তলায় পাথরের ইট, দুধারে দেওয়ালেও পাথরের ইট এবং মাথার ছাদে চওড়া মসৃণ বড়-বড় কালো পাথরের স্ল্যাব।

জীবনে বহুবার কর্নেলের সঙ্গী হয়ে কত সাংঘাতিক অভিযানে গেছি। কিন্তু এই অভিযান একেবারে অন্যরকম। কোন্ যুগে রায়গড়ের কোন্ রাজা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হলে যাতে নিরাপদে একটা নিবিড় অরণ্যপথে (সে যুগে জঙ্গলটা নিশ্চয় আরও দুর্গম আর বিস্তীর্ণ ছিল) সপরিবারে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে একটা নদীর তলা দিয়ে এই গোপন সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করেছিলেন। আর এতকাল পরে আমরা সেই পথে একটা মূর্তিমান বিভীষিকার মুখোমুখি হতে চলেছি! এই সব কথা ভেবেই যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্কে আমি উদ্বেলিত হচ্ছিলুম।

চলেছি তো চলেছি! মাঝে মাঝে কর্নেলের হাতে স্পটলাইটের ঝলকানি, তারপর নিবিড়কালো অন্ধকার। ঘড়ি দেখার কথা মনে ছিল না। তা ছাঁড়া প্রতি

মুহূর্তে হিংস্র জন্তুটার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কারণ ক্রমশ তার মরিয়া হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গের অন্যমুখে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তা টের পেয়ে সে আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কর্নেল বলেছেন, জন্তুটা আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে ভয় পায়। কেন তাঁর এমন ধারণা হল, বুঝতে পারছিলুম না। কিছুক্ষণ পরে স্পটলাইটের আলো ফেলে কর্নেল বললেন,—আমরা এখন নদীটার তলা দিয়ে যাচ্ছি। ওই দেখুন তপেশবাবু! ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

তপেশবাবু ছাদ লক্ষ্য করে বললেন,—ধসে পড়বে না তো?

—ধসে পড়ার কারণ নেই। সেকালের স্থপতি আর কারিগররা কত দক্ষ ছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র তার প্রমাণ আছে। জলের ফোঁটাগুলো নিচে পড়ে পাথরের ইটের ফাঁক দিয়ে তলার বালিতে মিশে যাচ্ছে। হ্যাঁ—কিছুটা পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলে আসুন।

নদীর তলায় সুড়ঙ্গপথে হেঁটে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক। কে বলতে পারে হঠাৎ এখনই এই প্রাচীন সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে যাবে না? প্রাণ হাতে করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। একসময় কর্নেল বললেন,—আমরা নদী পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার আরও সাবধান! পথটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরই আবার সেই কানে তালা ধরানো ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। —আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! সুড়ঙ্গের মধ্যে এই গর্জন শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল। গর্জন থামলে কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—শিম্পাঞ্জি বা গরিলারা কতকটা এইরকম গর্জন করে শুনেছি। কিন্তু—

তিনি হঠাৎ থেমে গেলে তপেশবাবু বললেন,—কিন্তু কী?

আসলে কর্নেল কান পেতে কী শুনছিলেন। বললেন,—গর্জনটা থেমে যাওয়ার পর প্রতিবার শুনেছি শুকনো ডালভাঙার মতো মট্‌মট্‌ শব্দ। শুনুন! শব্দটা ভারি অদ্ভুত!

তপেশবাবু এবং আমি দুজনেই এতক্ষণে স্পষ্ট শুনতে পেলুম মট্‌মট্‌ শব্দ। এই শব্দ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলেও শুনেছিলুম। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতরে শব্দটা যেন কোন অজানা বিভীষিকারই সাড়া। কোনও প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র প্রাণী যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এই শব্দ তারই পা ফেলার শব্দ।

মট্‌মট্‌ শব্দটা একটু পরে থেমে গেল। কর্নেল আবার পা বাড়ালেন। এবার ক্রমশ সুড়ঙ্গপথ একটু করে উঁচু হয়েছে। পাথরে জুতো স্লিপ করছে। তাই আমি দেওয়াল ঘেঁসে হাঁটছিলুম। কর্নেল আলো ফেলে হঠাৎ বললেন,—সাবধান! একটা সাপ মনে হচ্ছে!

তপেশবাবু বললেন,—কই? কোথায় সাপ?

—সামনে। ফণা তুলেছে!

—সর্বনাশ! তা হলে বিষাক্ত গোখরো সাপ। আলো দেখলে ওরা ফণা তোলে!

বলে তপেশবাবু কর্নেলের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি। গুলি করে ওর ফণাটা এখনই গুঁড়ো করে দিচ্ছি!

কর্নেল তাঁকে এগিয়ে যেতে দিলেন না। বললেন,—সাপটা কি বাবা হাড়মটমটিয়ার পোষা? তাকে কামড়ালে তো টের পেতুম। এক মিনিট! আমি সাপটার সঙ্গে একটু খেলা করি!

তপেশবাবু কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলুম,—কর্নেল! কর্নেল! আপনি সামরিক জীবনে অনেকবার বিষাক্ত সাপের পাল্লায় পড়েছেন, তা জানি। কিন্তু এখন আপনার হাতে শুধু একটা স্পটলাইট আর রিভলভার। আপনি আমাকে বলেছিলেন, একটা লাঠির সাহায্যে কতবার বিষাক্ত সাপ ধরেছেন। কিন্তু এখন লাঠিও তো নেই।

তপেশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন,—খেলা করে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না কর্নেল সায়েব! আমরা এখানে সাপের সঙ্গে খেলা করতে আসি নি!

কর্নেল তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন,—আপনার বেটনটা কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। ওটাই সাপ ধরার পক্ষে যথেষ্ট! বেটনটা দিন আমাকে।

ও.সি তপেশ সান্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন,—এই নিন। কিন্তু এটা লাঠির চেয়ে ছোট।

কর্নেল বললেন,—কেরালার বেদেরা এইটুকু লাঠি দিয়েই বিষাক্ত সাপ ধরে। দেখুন না! আপনি শুধু স্পটলাইটটা নিয়ে আমার পাশে এসে সাপটার ওপর আলো ফেলুন।

এতক্ষণে আমি চিত্রবিচিত্র ফণা তোলা সাপটাকে দেখতে পেলুম। ফণাটা একটু-একটু দুলছে। শিউরে উঠলুম।

কর্নেল গুঁড়ি মেরে বাঁ হাতে বেটন এবং ডান হাতে রিভলভার নিয়ে সাপটার সামনে প্রায় দু'মিটার তফাতে হাঁটু ভাঁজ করে বসলেন। তারপর আমাদের অবাক করে হেসে উঠলেন। বললেন,—এটাকে এমন ভাবে দেখতে পেয়েছিলুম, যেন ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তা এগিয়ে আসতেই পারে। কারণ সাপটা চড়াই থেকে উৎরাইয়ে নেমেছে।

কথাগুলো বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে সাপটার মাথা ধরলেন। তপেশবাবু বললেন,—এ কী!

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—সত্যিকার সাপ নয়। রবারের তৈরি খেলনা সাপ! কেউ অন্ধকার থেকে জোরে এই খেলনা সাপটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছে, যাতে আমরা ভয় পাই। হ্যাঁ—সে আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছে। সে জানে, আমরা গুলি করে সাপটা মারব। কিন্তু সে জানে না, জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজার আড়ালে আমাদের লোক ওত পেতে আছে।

কর্নেল বেটনটা ও.সি তপেশবাবুকে ফেরত দিয়ে স্পটলাইট নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। তপেশবাবু বললেন,—একটা কথা বুঝতে পারছি না। জন্তুটা তো জঙ্গলে সুড়ঙ্গের দরজায় গিয়ে দেখে আসতে পারে, কেউ সত্যি ওত পেতে আছে কি না।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে এখনও দিনের আলো আছে। সে দিনের আলোয় বেরুতে চায় না। অবশ্য তার মালিক কৃষ্ণকান্ত অধিকারী থাকলে অন্য কথা!

তপেশবাবু বললেন,—ওটা কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু?

—হ্যাঁ। এবার কিন্তু সাবধান! মনে হচ্ছে, সামনে এবার ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে!

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে স্পটলাইট জ্বেলে উপরদিকে আলো ফেললেন। ওদিকের মতো এদিকেও সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম।

তপেশবাবু উপরদিকে তাকিয়ে বললেন,—কর্নেল! শিম্পাঞ্জি বা গরিলাটাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে আর গর্জন করছে না কেন?

কর্নেল সিঁড়ির ধাপে সাবধানে পা ফেলে উঠতে উঠতে বললেন,—গর্জন করছে না, তার কারণ গর্জন করে-করে তার গলা ফেঁসে গেছে। ওই দেখুন, সে উঠে যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দশ-বারোটা ধাপ উঠেছি, উপরে আচমকা গুলির শব্দ এবং হইহল্লার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল বললেন,—সর্বনাশ! সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ রক্ষিত বা কনস্টেবল ওটাকে গুলি করে মারল নাকি?

তপেশবাবু বললেন,—ওঁদের গুলি করতে নিষেধ করে গেছি। সম্ভবত শূন্যে গুলি ছুঁড়ে জন্তুটাকে ভয় দেখালেন মিঃ রক্ষিত। রিভলভারের গুলির শব্দ মনে হল।

কর্নেল বললেন,—বেচারা হাড়মটমটিয়া বিপদে পড়ে গেছে। ওই দেখুন! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে করজোড়ে প্রাণভিক্ষা করছে।

অবাক হয়ে দেখলুম,—গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীটা দু'হাত জোড়

করে দাঁড়িয়ে আছে। স্পটলাইটের আলোয় তার দু'হাতের ধারালো নখগুলো ঝকমক করছে। দুটো দাঁত মুখের দুধারে বেরিয়ে আছে। দাঁত দুটো বাঁকা ধারালো তীক্ষ্ণাগ্র ছুরির মতো।

তপেশবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব! পোষা জন্তুরা মালিকের হুকুমে অনেক কসরত দেখাতে পারে। ব্যাটাচ্ছেলের প্রণামের ভঙ্গিটাও শেখানো। কিন্তু আমরা ভুল করেছি। ল্যাসো বা দড়ির ফাঁস কিংবা খাঁচার ব্যবস্থা করা যেত, যদি বন্যপ্রাণীসংরক্ষণ বিভাগে খবর দিয়ে আসতুম। এই অবস্থায় ওটাকে কী ভাবে ধরবেন বুঝতে পারছি না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তা সে বুঝে গেছে। এখন সে নিজের প্রাণভিক্ষা চাইছে। আসুন! রিভলভার তৈরি রেখে আমার পিছনে আসুন। বাবা হাড়মটমটিয়া আমাদের ওপর ঝাঁপ দিতে এলেই তিনটে গুলি তাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, এটুকু কি সে জানে না?

বলে তিনি জন্তুটার দিকে মুখ তুলে হাসলেন,—ঠাকুরবাবা! ওহে বাবা হাড়মটমটিয়া! উপরে উঠে যাও। তোমাকে কেউ গুলি করে মারবে না। তুমি উঠে গিয়ে মিঃ রক্ষিতের সামনে নমো করো গে! ওঠ! ওঠ!

মনে হল, কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর পোষ্য প্রাণী। তাই মানুষের কথা বোঝে। প্রাণীটা উপরে উঠে গেল। মিঃ রক্ষিতের গর্জন শুনতে পেলুম, —এক পা এগিয়েছ কি গুলি করে মারব! আরে! এ কী! জন্তুটা যে প্রণাম করছে! কী অদ্ভুত! আরে! আরে! এগিয়ো না বলছি! আশ্চর্য তো! এটা কি বনমানুষ?

কর্নেল সুড়ঙ্গের দরজার মুখে গিয়ে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আশ্চর্যই বটে! না-না ও পালাবে না। ও জানে, এবার পালানোর চেষ্টা করলেই ওর ঠ্যাং ভেঙে যাবে।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার পর তপেশবাবু, তারপর আমি বেরোলুম। জঙ্গলে এখন দিনের শেষে বিবর্ণ আলো আর ঠাণ্ডা হিম বাতাস। চির অন্ধকারের জগত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি এবং চেনা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। বুকভরে নিশ্বাস নিলুম। তারপর জন্তুটার দিকে তাকালুম।

জন্তুটার শরীর প্রকাণ্ড। দুটো হাত অস্বাভাবিক লম্বা। সারা গায়ে কালো লোম। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওর চোখ দুটো যেন মানুষেরই মতো।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আর কেন বাবা হাড়মটমটিয়া? এবার খোলস ছেড়ে বেরোও! নাকি আমি সাহায্য করব?

অমনই জন্তুটা মানুষের ভাষায় হাউমাউ করে কেঁদে বলে উঠল,—সার! আমার কোনও দোষ নেই। কেষ্ট অধিকারীর পাল্লায় পড়ে আমার এই দুর্দশা!

কর্নেল হাসলেন,—বুঝেছি! তা তুমিই সেই বাঁকা ডাকাত?


সমীর সরকার

তপেশবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন,—বাঁকা? এর নামে বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ডাকাতি আর খুনখারাপির কেস আছে!

কর্নেল বললেন,—বাঁকা নিজে শিম্পাঞ্জি বা গরিলার পোশাক খুলতে পারবে না। কেষ্ট অধিকারী অসাধারণ ধূর্ত! ওর গলার কাছে ব্যাটারিচালিত একটা খুদে জাপানি মাইক্রোফোন আর টেপরেকর্ডার ফিট করে দিয়েছে। একটা বোতাম টিপলে গর্জন শোনা যায়। অন্যটা টিপলে মটমট শব্দ হয়। বেচারা বাঁকাকে একেবারে বাঁকা করে রেখেছে কেষ্টবাবু!

বলে তিনি বাঁকাকে জন্তুর খোলস থেকে মুক্ত করলেন। বাঁকার শরীরও প্রকাণ্ড। মাথার চুল কাঁচাপাকা। পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা সোয়েটার। সে হাঁটু ভাঁজ করে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

কর্নেল খুদে টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে বললেন,—ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকবার টেপটা চালাতে হয়েছে আজ। এদিকে গত দু-তিনদিনও কয়েকবার টেপ বাজিয়েছে। ব্যাটারির দোষ কী?

তপেশবাবু খোলস বা ছদ্মবেশের হাত এবং পায়ের নখ, তারপর দাঁত দুটো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। বললেন,—এতো দেখছি ইস্পাতের তৈরি। ধারালো বাঁকা ছুরির মতো।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! সুড়ঙ্গের অন্য দরজায় সুরেন আর নরসিংহ আছে। মিঃ রক্ষিতকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। উনি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আপনি বাঁকা আর তার জন্তুর পোশাক নিয়ে কনস্টেবলের সঙ্গে এখনই থানায় ফিরে যান। তারপর পুলিশভ্যানে অন্তত একডজন আর্মড কনস্টেবলসহ সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখা চোরা আগ্নেয়াস্ত্রের পেটিগুলো নিয়ে আসা দরকার।

তপেশবাবু পকেট থেকে কর্ডলেস টেলিফোন বের করে বললেন,—কোনও অসুবিধে নেই। আমি ফোনে থানায় জানাচ্ছি। এস ডি পি ও সায়েব এস পি সায়েবকে খবরটা জানাবেন। জঙ্গিদের গোপনে অস্ত্রপাচারের খবর আমরা জানতুম। কিন্তু অস্ত্র পেয়ে যাব, চিন্তাই করিনি। আসলে এই সুড়ঙ্গ সম্পর্কে গুজব শুনেছি। কিন্তু আবিষ্কার করার চেষ্টা আমরা করিনি। আপনি কেমন করে জানলেন?

কর্নেল বললেন,—সুরেনের এই এলাকা নখদর্পণে। সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার সে একা করেনি। তার বন্ধু দীপুর সাহায্যে করেছিল। কারণ ওই গড়ে প্রত্নদফতর উৎখননের সময় দুজনেই ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে ঘুরত। ডঃ চট্টরাজ প্রত্নদফতরের অধিকর্তা ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

তপেশ কর্ডলেশ টেলিফোনে খবর দেওয়ার পর বললেন,—এখনই ফোর্স এসে যাচ্ছে। কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, ফোর্স না আসা পর্যন্ত আপনারা আমাকে সঙ্গ দিন।

ততক্ষণে মিঃ রক্ষিত বাঁকার দু'হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছেন এবং কনস্টেবলটি দড়িতে তার কোমর বেঁধে ফেলেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজন পুলিশ অফিসার স্পটলাইট জ্বেলে এগিয়ে এসে বললেন,—পুলিশভ্যান এসে গেছে সার!

তপেশবাবু কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আবার দেখা হবে।

কর্নেল বললেন,—আপাতত আমার একটা কাজ শেষ। পরের কাজটা পরে। এখন কফির জন্য আমি ছটফট করছি। চলি!

আমরা নাকবরাবর সিধে জঙ্গলের পথে বাংলোয় পৌঁছলুম। আজ আমার মধ্যে আর একটুও আতঙ্ক ছিল না।

বনবাংলোর চৌকিদার নাখুলাল উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল,—জঙ্গলে গুলির শব্দ শুনেছি সার! সুরেনের কোনও বিপদ হয়নি তো?

কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,—না নাখুলাল। বরং সুখবর আছে। যাকে তোমরা বাবা হাড়মটমটিয়া বলতে, সে একজন মানুষ। কালো জানোয়ারের পোশাক পরে সে ভয় দেখাত; যাতে এই জঙ্গলে মানুষজন ঢুকতে না পারে। তুমি বলেছিলে ভালুকের মতো একটা জানোয়ার। আসলে সে একজন ডাকাত। তার নাম বাঁকা। সে গোবিন্দকেও মেরেছে।

নাখুলাল অবাক হয়ে বললো,—বাঁকা ডাকাতের নাম শুনেছি সার! তা হলে জানোয়ার সেজে জঙ্গলে সে-ই ঘুরে বেড়াত? তাকে আপনারা ধরতে পেরেছেন?

—পেরেছি। এখন শিগগির তুমি কফির ব্যবস্থা করো। সুরেনের জন্য ভেবো না। সে একটু পরে এসে পড়বে।

বলে কর্নেল বাংলোর পিছন ঘুরে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন। তারপর ঘরের তালা খুলে বললেন,—জয়ন্ত! চীনে লণ্ঠনটা জ্বালো!

বাইরে আঁধার জমেছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। আলো জ্বেলে বললুম,—একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আপনি বলছিলেন, বাঁকা তার জানোয়ারের পোশাক নিজে খুলতে পারে না। তা হলে সে খাওয়াদাওয়া করত কীভাবে?

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—তুমি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারতে। বাঁকার মাথা ও মুখের অংশ খোলা যায় এবং ইস্পাতের ধারালো নখ-আঁটা হাত দুটোও দস্তানার মতো সে খুলতে পারে। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ অন্যের সাহায্য ছাড়া খোলা যায় না।

একটু পরে নাখুলাল কফি আনল। সে ঘটনাটা শোনার জন্য আগ্রহী,

তা তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—সব ঘটনা তুমি সুরেনের মুখে শুনতে পাবে নাখুলাল! তুমি কিন্তু মুখ বুজে থাকবে। কারণ আমরা চলে যাওয়ার পর কেষ্ট অধিকারীর লোকেরা তো রায়গড়ে থাকবে। তুমি সুরেনের মতো সব জেনে মুখ বুজে থাকলে তাদের হাতে বিপদে পড়বে না। বুঝেছ?

নাখুলাল চুপচাপ চলে গেল। আমি বললুম,—সুরেন সুড়ঙ্গের কথা জানত?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওর বন্ধু দীপুও জানত। তবে সুরেন ডঃ চট্টরাজের চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্যটাতে কী আছে, তা জানত না। তা জানতো শুধু দীপু। দীপুই বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিল। তাই তাকে উপেন দত্ত কিডন্যাপ করেছিল!

—কিন্তু এখনও দীপুর খোঁজ পাওয়া গেল না!

কর্নেল আস্তে বললেন,—সম্ভবত হালদারমশাই দীপুর ব্যাপারে কোনও সূত্র পেয়ে ডঃ চট্টরাজকে ফলো করে কলকাতা গেছেন। দেখা যাক, তিনি কী করতে পারেন।

একটু পরে বললুম,—কর্নেল! ডঃ চট্টরাজের তাঁবু থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা প্রথম আপনার কাছে আছে। আমার ধারণা দীপুর বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানো অঙ্কটাও আপনি তার একটা বই থেকে হাতিয়েছেন। এবার তার সাহায্যে প্রত্নদ্রব্যটা অর্থাৎ অদ্ভুত গড়নের ছোট্ট ধাতব জিনিসটা খুলে দেখুন না ওতে কী আছে?

কর্নেল বললেন,—চুপ! দেওয়ালের কান আছে। আর—ওই শোনো! বাংলোর নিচের রাস্তায় পুলিশভ্যান আর জিপগাড়ি যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। আমার একসময়কার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত অধিকারী এবার নিছক কেষ্ট অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। জয়ন্ত! এই কেসের এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। তাই না?

## ।। এগারো ।।

সেই রাত্রে পুলিশবাহিনী গড়ের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের পেটিগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় বাংলোর কাছে সুরেনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ও.সি তপেশ সান্যাল কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে কী সব কথা আলোচনা করে চলে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে জ্যোৎস্না ফুটেছিল। কিন্তু কুয়াশামাখা সেই জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। সুরেন তার লম্বা ধারালো দা খুড়ো নাখুলালের কাছে রেখে আমাদের ঘরে এসেছিল! কর্নেলের জন্য ততক্ষণে দ্বিতীয় দফা কফি নাখুলাল দিয়ে গেছে। সুরেনও আমাদের সঙ্গে কফি খেল। কর্নেলের মতে, একটা সাংঘাতিক ঘটনার পর সুরেনেরও কফি খাওয়া দরকার। নার্ভ চাঙ্গা হবে।

সুরেন বলেছিল,—উঁকি মেরে দেখেছিলুম জনাতিনেক লোক গড়ের দিকে আসছে। তখন একটু আঁধার নেমেছে। নরসিংহদাকে কথাটা বলামাত্র উনি রাইফেল বাগিয়ে আমাকে টর্চ জ্বালতে বললেন। টর্চের আলোয় রাইফেলধারী পুলিশ আছে টের পেয়ে লোকগুলো কেটে পড়ল। নরসিংহদাও চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৌন বা?

সুরেন হেসে অস্থির। কর্নেল তাকে বলেছিলেন,—তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি তো?

—না সার! তবে আমার মনে হচ্ছে, ওরা আসানসোলে কেষ্টবাবুকে খবর দিতে গেছে!

—যাওয়ারই কথা। পুলিশ আজ রাতেই আসানসোল থানাকে খবর দেবে। কেষ্ট অধিকারীর অফিস, দোকান আর সেখানকার বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি চালাবে। যত শিগগির সম্ভব। কেষ্টবাবুকে পাকড়াও করা দরকার। তা না হলে দীপুর বিপদের আশঙ্কা আছে।

সুরেন বলেছিল,—কেন? দীপু তো কেষ্টবাবুর বিরুদ্ধে কিছু করেনি!

—সুরেন! দীপু কিছু না করলেও এ পর্যন্ত সব ঘটনা তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। তাই কেষ্টবাবুর রাগ দীপুর ওপরই পড়বে।

—সার! দীপু কি কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছে বলে আপনার ধারণা?

—জানি না। তবে বলা যায় না। দেখা যাক।

রাত দশটা নাগাদ আমরা খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলুম। সকালে নাখুলালের ডাকে আমার ঘুম ভেঙেছিল। সে বেড-টি এনেছিল, বাইরে শীতের সকাল কুয়াশায় ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। আজ শীতটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। নাখুলাল সোয়েটারের ওপর কম্বল চাপিয়েছিল। সে বললো,—আজ শীত খুব জমেছে সার!

বললুম,—তা টের পাচ্ছি। কিন্তু এমন প্রচণ্ড শীতে কর্নেলসায়েব বেড়াতে বেরিয়েছেন। তোমাকে কিছু বলে যাননি?

নাখুলাল বললো,—না সার! সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে সায়েব গড়ের দিকে যাচ্ছেন দেখেছি।

বুঝতে পারলুম না আবার কেন কর্নেল গড়ের জঙ্গলে গেছেন। ওখানে কেষ্টবাবুর লোকেরা আচমকা হামলা করতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে শীতের উপদ্রবে প্যান্টশার্ট সোয়েটার আর পুরু জ্যাকেট-পরে লনে রোদে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোদের তেজ কম। সকাল আটটা বাজে। তবু অদূরে ঘন কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রায় আধঘণ্টা পরে কুয়াশা

কিছুটা কেটে গেল। সেই সময় বাংলোর নিচের পথ থেকে মাথায় হনুমান টুপি, গলাবন্ধ কোট আর প্যান্টপরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলুম। বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পারলুম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই!

সম্ভাষণ করলুম,—সুপ্রভাত হালদারমশাই! আপনার ফোন করার কথা ছিল। কিন্তু সশরীরে এসে পড়লেন যে?

গোয়েন্দাপ্রবর ক্লান্তভাবে বললেন,—আর কইবেন না জয়ন্তবাবু! কইলকাত্তা গেছি আর ফিরছি। সিট পাই নাই। সারা পথ খাড়াইয়া আইছি।

তখনই নাখুলালকে ডেকে কফি তৈরি করতে বলে হালদারমশাইকে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলুম। দেখলুম, উনি হাতে দস্তানা পরেছেন। দস্তানা এবং হনুমান টুপি খুলে চেয়ারে বসলেন হালদারমশাই। বললুম, —খবর পরে শুনব। আগে কফি আসুক।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জিজ্ঞেস করলেন,—কর্নেল স্যার গেলেন কই?

বললুম,—প্রাতঃভ্রমণে। গড়ের দিকে সুরেনের সঙ্গে কর্নেলকে যেতে দেখেছে নাখুলাল!

হালদারমশাই তাঁর গলাবন্ধ কোটের বোতাম খুলে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। তিনি ভাঁজ খুলে কাগজটা আমাকে দেখিয়ে চাপাস্বরে বললেন, —গড়ের ম্যাপ আনছি। এই কালো দাগটার পাশে লেখা আছে 'টানেল।' তার মানে সুড়ঙ্গ!

অবাক হয়ে বললুম,—কোথায় পেলেন এই ম্যাপ?

গোয়েন্দাপ্রবর খিখি করে আড়ষ্ট হেসে বললেন,—ওঃ চট্টরাজেরে ফলো করছিলাম। উনি আমারে ক্যামনে চিনবেন? এয়ারকন্ডিশনড চেয়ারকারে পাশাপাশি সিট।

—বলেন কী! তা হলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয়েছিল আপনাকে?

—নাঃ! তত বেশি কিছু না। করবটা কী, কন? ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। অথচ চট্টরাজেরে ফলো করতেই হইব।

—বুঝলুম। কিন্তু এই ম্যাপটা?

নাখুলাল কফি আর স্ন্যাক্স্ নিয়ে ঢুকল। হালদারমশাইকে সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই বললেন,—ডঃ চট্টরাজ ব্রিফকেস থেকে একটা ডায়রি বই বার করছিলেন। তখনই ভাঁজকরা কাগজখান ওনার পায়ের কাছে পড়ল। উনি ট্যার পাইলেন না। তারপর উনি যখন বাথরুমে গেছেন, তখন এই কাগজখান আমি হাতাইলাম। বুঝলেন তো?

হালদারমশাই হাসতে হাসতে আবার কফিতে মন দিলেন। আমি ম্যাপটা

দেখেই বুঝতে পারলুম, সরকারি পুরাদফতরের প্যাডে আঁকা রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপ। এটা মূল ম্যাপ নয়। সরকারি লেখ্যাগারের সংরক্ষিত প্রাচীন ম্যাপের নকল। ম্যাপে দুর্গ এবং সুড়ঙ্গপথের রেখাচিত্র আছে। একখানে চৌকো ঘরের নকশার পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে ঃ 'ট্রেজারি'। অর্থাৎ রাজকোষ। সুড়ঙ্গের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেলুম।

খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখতে দেখতে কফি খাচ্ছি, এমন সময় কর্নেলের সাড়া পাওয়া গেল। বারান্দায় উঠেই তিনি সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং হালদারমশাই! আপনাকে এত শিগগির কলকাতা থেকে ফিরতে দেখে আমি অবাক হইনি।

হালদারমশাই কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চাপা স্বরে বললেন,—দীপুর খোঁজ পাইছি। সে কলকাতায় ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে ছিল। তারে আনবার জন্যই চট্টরাজ গিছলেন। তারপর তারে লইয়া উনি রাত্রের ট্রেনে আসানসোলে ব্যাক করলেন। আসানসোলে মিঃ অধিকারীর বাড়িতেই দীপুরে সম্ভবত লইয়া গেলেন। আমি আসানসোলে নামলাম না। ক্যান কী, খবরটা আপনারে জানানো দরকার।

সুরেন সম্ভবত তার খুড়োকে কর্নেলের কফি তৈরি করার জন্য বলতে গিয়েছিল। এই সময় সে ফিরে এল। তারপর হালদারমশাইকে দেখে সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কর্নেল তাকে বললেন,—সুরেন! তা হলে তুমি রংলিডিহি থেকে শিবু ওঝার ছেলেকে ডেকে আনো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দশটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

সুরেন চলে গেল। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল টুপি, কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি টেবিলে রেখে বললেন,—গড়ের একটা ধ্বংসস্তূপের মাথায় প্রকাণ্ড একটা পিপুল গাছে অদ্ভুত প্রজাতির পরগাছা দেখে এলুম। সুরেন অত উঁচু গাছে চড়তে পারল না। শিবু ওঝার ছেলে ডন নাকি গাছে চড়তে ওস্তাদ। আমি অবশ্য ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে ছবি তুলেছি।

নাখুলাল কফি রেখে গেল। কর্নেল তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। এবার জিজ্ঞেস করলুম,—আচ্ছা কর্নেল, আপনি হালদারমশাইকে ফিরতে দেখে অবাক হননি কেন?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন,—এবার হালদারমশাইয়ের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শোনা যাক।

হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম এই ঃ

কর্নেলের নির্দেশে আসানসোলে গিয়ে কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর কোম্পানির হেড অফিস খুঁজে বের করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। কেষ্টবাবু সেখানে নামকরা

ব্যবসায়ী। এক কর্মচারীর কাছে হালদারমশাই কেষ্টবাবুর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলে ভদ্রলোক বলেন, অধিকারীসায়েব এই অফিসের তিনতলায় থাকেন। তাঁর আসল বাড়ি রায়গড়ে। তবে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। খুব ব্যস্ত আছেন।

হালদারমশাই কাছেই একটা হোটেলে ওঠেন। হোটেলের তিনতলায় তাঁর রুম। তাই কেষ্ট অধিকারীর অফিসবাড়ির উপরতলার দিকে তাঁর নজর রাখার সুবিধা ছিল। রাত্রে তিনি রায়গড় থানায় ফোন করে জানান, এখনও কোনও খবর নেই। সকালে আবার ফোন করবেন। পরদিন সকালে কেষ্টবাবুর অফিসবাড়ির তিনতলার ছাদে হালদারমশাই রোদে দুজনকে চেয়ারে বসে চা বা কফি খেতে দেখেন। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের চেহারার বর্ণনা কর্নেল তাঁকে দিয়েছিলেন। তাই তিনি ডাঃ চট্টরাজকে চিনতে পারেন।

দুপুরে খাওয়ার পর হালদারমশাই দেখতে পান, কেষ্টবাবু এবং ডঃ চট্টরাজ একটা গাড়িতে উঠছেন। দ্রুত নেমে গিয়ে তিনি একটা অটোরিক্স ভাড়া করে সাদা গাড়িটিকে অনুসরণ করেন। গাড়িটা রেল স্টেশনে গিয়েছিল। এর পর তিনি ডঃ চট্টরাজকে ট্রেনের চেয়ারকারে উঠতে দেখেন। চেয়ারকারে উঠে চেকারকে অনুরোধ করে টিকিটের ব্যবস্থা করেন। চেয়ারকার প্রায় খালি ছিল। এর পর ডঃ চট্টরাজের পাশের সিটে বসে একসময় তিনি রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপটা পেয়ে যান। কীভাবে পান, তা তিনি আমাকে আগেই বলেছেন। এবার কর্নেলকে সবিস্তারে বলে নিজের অভিযানের বাকি অংশে চলে এসেছিলেন।

গাড়ি বর্ধমান পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। তাঁর গায়েপড়া আলাপে ডঃ চট্টরাজ বিরক্ত হচ্ছিলেন, হালদারমশাই তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়ার ঝামেলা সম্পর্কে হালদারমশাই কথা তোলেন। তখন ডঃ চট্টরাজ বলেন, তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করবে স্টেশনে। হালদারমশাই তখন করুণ মিনতি করে ডঃ চট্টরাজের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে বলেন। হালদারমশাইয়ের হার্টের অসুখ আছে! তাছাড়া তিনি যাদবপুর এলাকাতেই থাকেন।

এইভাবে গোয়েন্দাপ্রবর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ডঃ চট্টরাজের গাড়িতে ঠাঁই জোগাড় করেন। ড্রাইভারের সঙ্গে একজন শক্তসমর্থ চেহারার লোক এসেছিল। তাকে ডঃ চট্টরাজ জিজ্ঞেস করেন, শ্রীমান দীপু কেমন আছে? কথাটা শুনেই হালদারমশাই কান পাতেন। কিন্তু চোখ বন্ধ। হার্টের রুগি তো!

লোকটি বলে,—দীপু বড্ড বেগড়বাঁই করছে।

ডঃ চট্টরাজ বলেন,—ওকে আজই রাত বারোটা পাঁচের ট্রেনে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমি নিজেই নিয়ে যাব। আমার একটু ধকল হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে?

ডঃ চট্টরাজ তাঁর বাড়ির কাছে হালদারমশাইকে নামিয়ে দিয়ে যান। এরপর হালদারমশাই লেকভিউ রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরেন। তারপর হনুমান টুপি পরে পোশাক একেবারে বদলে চোখে চশমা এঁটে ঠিক সময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছান। তিনি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার সময় দীপুর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, সে উপেন দত্তের বাড়ি থেকে পালিয়ে সরল বিশ্বাসে ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ডঃ চট্টরাজ তাকে চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্য উদ্ধারে সাহায্যের ছলে আটকে রাখেন। দীপুর অবশ্য এতে উৎসাহ থাকারই কথা। ডঃ চট্টরাজকে হালদারমশাই বলতে শুনেছিলেন—মিঃ অধিকারীই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। মিঃ অধিকারীর গাড়িতে আমরা সোজা রায়গড় যাব। চিন্তা কোরো না! আগে হারানো জিনিসটা উদ্ধার করা যাক।

ততক্ষণে কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছেন। গোয়েন্দা প্রবরের কথা শেষ হলে তিনি চোখ খুলে বললেন,—গত রাতে আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিস আর গোডাউনে পুলিশের হানা দেওয়ার কথা। পুলিশ ওখানে কেষ্টবাবু, ডঃ চট্টরাজ আর দীপুকে পেলে এতক্ষণ রায়গড় থানায় খবর আসত এবং খবরটা থানা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছুত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ধূর্ত কেষ্টবাবু দীপুকে নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ছলে কোথাও গাঢাকা দিয়েছে। ডঃ চট্টরাজ সম্ভবত হাওয়া আঁচ করে স্টেশন থেকেই কেটে পড়েছেন! হালদারমশাই আসানসোলে নেমে রায়গড় থানায় রিং করতেন!

আমি বললুম,—উনি তো গতকাল কী ঘটেছে জানেন না! আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিসে পুলিশ হানা দেবে, তা-ই বা কেমন করে জানবেন?

কর্নেলের কথা শুনে হালদারমশাই হতবাক হয়ে বসে ছিলেন। এবার শুধু বললেন,—হঃ!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত! তবে হালদারমশাই অত্যন্ত মূল্যবান খবর এনেছেন।

হালদারমশাই আস্তে বললেন,—দীপু কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়ছে ক্যান? কেষ্টবাবু কি তারে ডঃ চট্টরাজের মতন আটকাইয়া রাখবে? জয়ন্তবাবু কাইল কী সব ঘটছে কইলেন। কী ঘটছে?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—কেষ্টবাবু এখন মরিয়া। কেন, সে কথা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় শুনবেন। গতকাল আমরাও একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছিলুম। তা ছাড়া আরও কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের ঘরে ব্রেকফাস্টের সময় কর্নেল হালদারমশাইকে কালকের সব ঘটনা শোনালেন। গোয়েন্দপ্রবর মাঝেমাঝে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠছিলেন,—আঃ! আমি মিস্ করছি!

সেই জন্তুটা যে ছদ্মবেশী দুর্ধর্ষ বাঁকা ডাকাত, এ কথা শুনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ খি খি করে হেসে অস্থির হলেন। বললেন,—অরে এট্টুখানি দেখছিলাম! ভাগ্যিস গুলি করি নাই!

বললুম,—কর্নেল কেন বলতেন, জন্তুটা ফায়ার আর্মস্‌কে খুব ভয় পায়, সেটা পরে বুঝেছি।

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! জন্তু হইলে ভয় পাইব ক্যান? জন্তুরা কি ফায়ারআর্মস বোঝে?

সওয়া দশটা নাগাদ সুরেন তার সমবয়সী একটা রোগা গড়নের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। কর্নেল সহাস্যে বললেন,—এই তোমার ডন!

সুরেন বললো,—হ্যাঁ সার! আমাদের ফাদার এর ডাকনাম ডন দিয়েছেন। এর খ্রিস্টান নাম ড্যানিয়েল কালীপ্রসাদ বেস্‌রা। মিশন স্কুল ছেড়ে ফাদারের ভয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! রাত জেগে এসেছেন। ঘুমিয়ে নিন! জয়ন্ত! আমার সঙ্গী হবে নাকি?

বললুম,—আমার মাথাখারাপ? অন্য ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যেতে সবসময় রাজি। কিন্তু আপনি যখন বনেবাদাড়ে পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের জন্য বেরুচ্ছেন, তখন আমি সঙ্গী হতে রাজি নই! ঠেকে ঠেকে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

কর্নেল হাসতে হাসতে সুরেন ও ডনের সঙ্গে চলে গেলেন। হালদারমশাই আর আমি লনে রোদ্দুরে দুটো চেয়ার পেতে বসলুম। হালদারমশাই বললেন, —একটা কথা বুঝি না। কেষ্টবাবু পোলাটারে আটকাইয়া রাখব ক্যান?

সায় দিয়ে বললুম,—ঠিক বলেছেন! দীপুকে আটকে রেখে কেষ্ট অধিকারীর কী লাভ? যে জিনিসটা বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানোর জন্যে দরকার ছিল, সেটা তো উপেন দত্তকে শিম্পাঞ্জির ছদ্মবেশে বাঁকা ডাকাত খুন করার পর কর্নেলের হাতে চলে এসেছে—

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় দেখলুম কুমুদবাবু হন্তদন্ত হয়ে গেট খুলে বাংলোর লনে ঢুকছেন। তিনি এসে কাঁদো-কাঁদো মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—কর্নেল সায়েব কোথায়? এদিকে এক সর্বনাশ!

বললুম,—কী হয়েছে কুমুদবাবু?

কুমুদবাবু পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে করুণ মুখে বললেন,—এই চিঠিটা আজ ভোরে বাইরের ঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে কে ঢুকিয়ে রেখেছিল। লক্ষ্য করিনি। কিছুক্ষণ আগে মেঝে পরিষ্কার করার সময় দীপুর মায়ের চোখে পড়ে। এটা দীপুর লেখা চিঠি। পড়ে দেখুন।

চিঠিটা খুলে দেখলুম লেখা আছে ঃ

*"বাবা,*

*চট্টরাজসায়েবের ক্যাম্প থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা নাকি কোন্ কর্নেলসায়েবের কাছে আছে। তাঁকে এই চিঠি দেখিয়ে বলবেন, ওটা যেন তিনি আজই রাত দশটায় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে সেই ডোবার পাড়ে রেখে আসেন। পুলিশকে জানালে আমাকে এরা মেরে ফেলবে। জিনিসটা পেলে আমাকে এরা ছেড়ে দেবে। না পেলে আজ রাত একটায় আমাকে এরা মেরে ফেলবে। ইতি,*

*দীপু"*

হালদারমশাই আমার মুখের কাছে মুখে এনে চিঠিটা পড়ছিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে ঝাপটা মারছিল। তিনি এবার সরে বসে উত্তেজিতভাবে বললেন,—কর্নেলস্যারেরে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

কুমুদবাবু ভাঙা গলায় বললেন,—কর্নেলসায়েব কোথায় গেছেন?

বললুম,—ওঁর যা বাতিক! গড়ের জঙ্গলে পরগাছা আনতে গেছেন! আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলুম। একটু পরে হালদারমশাই বললেন,—গড়ের জঙ্গল কোথায়? আমারে দেখাইয়া দিলে কর্নেলস্যারেরে খবর দিতাম! জয়ন্তবাবু চেনেন না? কুমুদবাবু, আপনি নিশ্চয় চেনেন?

কুমুদবাবু বললেন,—আমার যা অবস্থা, অনেক কষ্টে এসেছি। এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর কোণে। নদীর ওপারে। নদীতে অবশ্য তত জল নেই।

আমারে দেখাইয়া দ্যান। —বলে গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সত্যি বলতে কি, চিঠিটা পড়ার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। কুমুদবাবু বারান্দা থেকে নেমে হালদারমশাইকে দূরে গড়ের জঙ্গল অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপে গজিয়ে ওঠে জঙ্গলটা দেখিয়ে দিলেন। হালদারমশাই আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নাখুলালকে ডেকে কুমুদবাবুর জন্য চা আনতে বললুম। নাখুলাল কুমুদবাবুকে 'নমস্তে' করে চলে গেল।

কর্নেল সুরেন আর ডনের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় বারোটা বাজে। দেখলুম, একটুকরো মোটা ডালে লালরঙের ঝলমলে ফুল এবং সবুজ চিকন পাতার পরগাছা আটকানো। শেকড়বাকড় কিছুটা দু'ধারে ঝুলে আছে। কর্নেল কুমুদবাবুকে দেখে বললেন,—এক মিনিট। এটা নাখুলালকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে বলে আসি।

বললুম,—হালদারমশাই কোথায়? উনি তো আপনাকেই ডাকতে গেছেন!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন,—হালদারমশাই? তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি!

কর্নেল বাংলোর পিছনদিকে চলে গেলেন। কুমুদবাবু বললেন,—দেখা না হয়েই পারে না জায়গাটা গোলকধাঁধার মতো। হয় তো এখনও উনি কর্নেলসায়েবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে ডনকে কিছু টাকা দিলেন। ডন খুশি হয়ে চলে গেল। সুরেন গেল তার খুড়োর কাছে। কর্নেল এসে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটা কিছু ঘটেছে, তা বুঝতে পারছি। বলুন কুমুদবাবু!

কুমুদবাবু চিঠির ব্যাপারটা বলে রুমালে চোখে মুছলেন। কর্নেল বললেন,—চিঠিটা হালদারমশাই নিয়ে গেলেন কেন? চিঠিটা আমার দেখার দরকার ছিল।

কুমুদবাবু বললেন,—ওটা দীপুরই হাতের লেখা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করুন। ঘৃণাক্ষরে চিঠির কথা যেন আর কাউকেও জানাবেন না।

কুমুদবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কৃষ্ণকান্তবাবু বাড়িতে নেই। উনি—

তাঁর কথার উপর কর্নেল বললেন,—কুমুদবাবু! কৃষ্ণকান্ত অধিকারীই আপনার ছেলে দীপুকে আটকে রেখেছে। কিন্তু সাবধান! একথাও যেন আপনি ছাড়া কেউ না জানতে পারে।

কুমুদবাবু চমকে উঠেছিলেন। তিনি মুখ নিচু করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বাংলোর পশ্চিমদিকে গিয়ে বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখছিলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছিলুম। প্রায় পনের মিনিট পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। তিনি ঘড়ি দেখে বললেন,—লাঞ্চের সময় হয়েছে। আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে বেরুব। হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। উনি যখন খুশি ফিরে লাঞ্চ খাবেন।

বললুম,—ওঁর কোনও বিপদ হয়নি তো?

—বলা যায় না। হঠকারী আর জেদী মানুষ মাঝেমাঝে নিজেকে আগের

মতোই পুলিশ অফিসার ভেবে বসেন, এটাই হালদারমশাইয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা।

বলে কর্নেল পোশাক বদলাতে বাথরুমে ঢুকলেন।

আরও আধঘণ্টা দেরি করে সওয়া একটায় আমরা খেয়ে নিলুম। তারপর দুটোর সময় কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! হালদারমশাই সম্ভবত কেষ্ট অধিকারীর ফাঁদে নিজের অজ্ঞাতসারে পা দিয়েছেন। চলো! তাঁর খোঁজে বেরুনো যাক। সুরেনকে ডেকে নিচ্ছি। গড়ের জঙ্গল তার নখদর্পণে।

কর্নেল, সুরেন আর আমি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে ডাইনে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল এবং বাঁ দিকে সমান্তরালে নদী রেখে গড়ের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছুলুম। সেখানে নদী পেরিয়ে পশ্চিম গড়ের ধ্বংসস্তূপে ঢুকলুম। কর্নেল এতক্ষণ বাইনোকুলারে চারদিক মাঝেমাঝে দেখে নিচ্ছিলেন। গড়ের ধ্বংসস্তূপের গোলকধাঁধায় ঢোকার পর তিনি বললেন,—সুরেন! দেখ তো ওটা কী?

সুরেন এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতে একটা নোংরা রুমাল তুলে ধরল। আমি চমকে উঠে বললুম,—এটা দেখছি হালদারমশাইয়ের নাকের নস্যি মোছা রুমাল!

আরও কিছুক্ষণ ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে এগিয়ে একখানে থেমে কর্নেল বললেন,—কী আশ্চর্য!

সুরেন বলে উঠল,—সার! ওই দেখুন, কারা সুড়ঙ্গের দরজায় কত বড় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে!

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে ঝোপ সরিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! সুরেন! এসো, আমরা পাথরটা সরানোর চেষ্টা করি। কেষ্টবাবুর লোকেরা সুড়ঙ্গের ছোট্ট দরজাটা পাথর দিয়ে কেন বন্ধ করে গেছে, দেখা যাক।

## ॥ বারো ॥

সেই জগদ্দল পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজা থেকে সরাতে ঠাণ্ডাহিম শীতের বিকেলে আমাদের শরীর প্রায় ঘেমে উঠেছিল। অনেক চেষ্টার পর পাথরটা একপাশে সরানো গেল মাত্র। তবে এবার অন্তত একজন সুড়ঙ্গে ঢোকার মতো ফোঁকর সৃষ্টি হল। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিতে একটা স্তূপে উঠলেন। তারপর নেমে এসে বললেন,—এখন একটাই সমস্যা। ভিতরে ঢুকলে কেষ্টবাবুর কোনও লোক যদি সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সে গুলি ছুড়তে পারে। আমরা আত্মরক্ষার সুযোগ পাব না।

বললুম,—ঠিক বলেছেন। আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারি কেষ্ট অধিকারী। কাজেই সুড়ঙ্গে তার লোক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বন্দি হালদারমশাইকে পাহারা দিতেই পারে!

সুরেন বললো,—সার! ওঁকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ধরে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁকে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওরা গুলি করে মারেনি তো?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাইকে মেরে ফেলে কেষ্টবাবুর লাভ নেই। বরং ওঁকে বন্দি রেখে আমার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে সেই বত্রিশের ধাঁধামার্কা জিনিসটা দাবি করবে। দীপু আর হালদারমশাই দুজনেই কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছেন। এতে কেষ্টবাবু আমার ওপর আরও চাপ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে!

সুরেন বললো,—সার! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে—

কর্নেল তার কথার উপর বললেন,—হাড়মটমটিয়ার যুগ শেষ সুরেন! তুমি কি বুঝতে পারছ না কেষ্টবাবু তার চোরাকারবার নিরাপদে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকদিন—হয়তো অনেকবছর ধরে বাঁকা ডাকাতকে কাজে লাগিয়েছিল? তার গলার কাছে আঁটা খুদে জাপানি টেপরেকর্ডারে মট্‌মট্‌ শব্দ বাজিয়ে সে এমন একটা অবস্থা তৈরি করেছিল, যাতে ওই জঙ্গলে সন্ধ্যার পর এমন কি দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে ভয় পায়!

বললুম,—কিন্তু বেলা পড়ে আসছে কর্নেল! কী করা উচিত এখনই ঠিক করা যাক্‌।

সুরেন বললো,—একটা কথা ভাবছি সার! জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজাটাও কি কেষ্টবাবুর লোকেরা এমন করে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে?

কর্নেল বললেন,—সুরেন! একটা কাজ করতে পারবে? এখান থেকে বেরুলে নদী পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে সিধে ফাঁকা মাঠ। দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে রায়গড় থানায় যেতে পারবে?

সুরেন বললো—পারব সার!

—তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে থানার ও.সি তপেশবাবু কিংবা ডিউটি অফিসারের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি একা এস না। পুলিশের সঙ্গে আসবে।

বলে কর্নেল তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা নোটবই বের করে একটা পাতায় দ্রুত চিঠি লিখে ফেললেন। তারপর নিজের একটা নেমকার্ড সুরেনকে দিলেন। সেই সঙ্গে নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে চিঠিটাও দিলেন। সুরেন পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কর্নেল বললেন,—এক মিনিট! গড়ের জঙ্গল থেকে বেরুনোর পথে তোমার বিপদ হতেও পারে। চলো! আমি তোমাকে নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে আসি! জয়ন্ত! তুমি তোমার রিভলভার বের করে হাতে রাখো। আর এক কাজ করো। ওই স্তূপের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকো। কেউ যেন তোমাকে না দেখতে পায়! সাবধান!

কর্নেল সুরেনকে নদীর ধারে পৌঁছে দিতে গেলেন। আমি কর্নেলের কথা মতো রিভলভার হাতে নিয়ে সেই ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসলুম। অস্বীকার করব না, অজানা আতঙ্কে আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কেষ্টবাবুর অনুচররা আচমকা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হালদারমশাইয়ের মতো বন্দি করবে। রিভলভার তো হালদারমশাইয়ের কাছেও ছিল!

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। কর্নেলকে ফিরতে দেখে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আশা করি, তোমাকে ভূতেরা ঢিল ছোঁড়েনি?

বললুম,—না। আপনাকে ছুঁড়েছিল নাকি?

—ফেরার পথে ছুঁড়েছিল।

—সর্বনাশ! তা হলে কেষ্টবাবুর লোকেরা এখনও কাছাকাছি কোথাও আছে!

—আছে। বোকামি করে নিজেরাই সেটা জানিয়ে দিল।

—ভাগ্যিস ওরা গুলি ছোঁড়েনি!

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আমাকে আড়াল থেকে গুলি করে মারলে কেষ্টবাবু সেই মোগলাই রত্নকোষ আর পাবে না, তা ভালই বোঝে। যাই হোক, পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা সামনেকার এই স্তূপে উঁচুতে বসে থাকি। সাবধানে উঠবে। পা পিছলে পড়ে গেলে হাড় ভেঙে যেতে পারে।

দুজনে একটা নগ্ন উঁচু ধ্বংসস্তূপে উঠে বসলুম। নিরেট পাথরে ঠাসা এই ধ্বংসাবশেষে কোনও উদ্ভিদ গজাতে পারেনি। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। দূরে কুয়াশা ঘনিয়েছে। চারদিকে এতক্ষণে পাখিদের দিনশেষের কল-কাকলি শোনা যাচ্ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। ঘড়ি দেখলুম, চারটে বাজে। এত শিগগির এখানে শীতের দিন ফুরিয়ে যায় কেন? একটু পরে বুঝতে পারলুম, কুয়াশার জন্যই রোদ্দুর এত ম্লান হয়ে গেছে। আধঘণ্টা পরে কর্নেল বাইনোকুলারে পূর্বদিক দেখতে দেখতে বললেন,—বাঃ! তপেশবাবুরা এসে গেছেন! এস, নেমে পড়া যাক।

আমরা সবে স্তূপ থেকে নেমেছি, হঠাৎ দেখি, সুড়ঙ্গের দরজার ফোঁকর দিয়ে লাল ধুলো মাখা চুল আর একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে। কর্নেল ছুটে গিয়ে বললেন,—হালদারমশাই! আপনাকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ছেড়ে দিল তা হলে

হালদারমশাইয়ের মুখে টেপ আঁটা আছে। কর্নেল টেপ টেনে খুলতেই উনি উহু হু হু করে উঠলেন যন্ত্রণায়। তারপর বললেন,—আমার হাত দুইখান পিছনে বাঁধা আছে। আমারে উঠাইয়া লন।

ওঁকে কর্নেল এবং আমি দু'দিক থেকে ধরে টেনে বের করলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে হাতের বাঁধন কেটে দিলেন। গোয়েন্দাপ্রবরের সারা শরীরে লাল ধুলোকাদা মাখা। একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি বললেন,—সবখানে হালারা আমারে বান্ধে ক্যান? আচমকা আমার উপর ঝাঁপ দিয়া—ওঃ!

কর্নেল বললেন,—আপনাকে বেঁধে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছিল। সুড়ঙ্গের মধ্যে দীপুকে দেখলেন?

—অরে দেখছি। অরে বান্ধে নাই। টর্চের আলো জ্বালছিল কেষ্টবাবু। তারে চিনছিলাম। কিছুক্ষণ আগে উল্টাদিক থেইক্যা টর্চ জ্বালতে জ্বালতে কেউ আইয়া কইল, স্যার! গতিক ভালো না। সুরেনেরে দৌড়াইয়া যাইতে দেখছি। হয়তো থানায় খবর দিতে গেল। সুড়ঙ্গের পশ্চিমের দরজায় পাথর আটকানো ঠিক হয় নাই। তখন কেষ্টবাবু কইল, এই টিকটিকিটা এখানে বান্ধা থাক্। চলো, দীপুকে লইয়া আমরা জঙ্গলের মধ্যে যাই। অরা পলাইয়া গেল। আমার দুই পাঁও বান্ধা ছিল। দেওয়ালের একখানে পাথরের ইট এট্টুখান উঁচু ছিল। সেখানে আন্ধারে পাঁওয়ের দড়ি ঘষতে ঘষতে যখন ছিঁড়ল, তখন খাড়া হইলাম।

এইসময় তপেশবাবু সদলবলে এসে পড়লেন। তিনি হালদারমশাইকে বললেন,—এ কী অবস্থা মিঃ হালদারের! সুরেনের মুখে অবশ্য ওঁর রুমাল কুড়িয়ে পাওয়ার কথা শুনেছি।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্বদরজার কাছে আপনার লোকেরা আছে তো?

ও.সি তপেশ সান্যাল বললেন,—আপনার চিঠি পেয়ে প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে দুজন অফিসার আর ছ'জন আর্মড কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি। ওঁরা গেছেন জিপ গাড়িতে। খেলার মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে জিপগাড়ি চলার অসুবিধে নেই। কাল রাত্রেই সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। ঝোপঝাড় কোনও বাধা নয়। এবার বলুন, কী করব? সুড়ঙ্গের দরজার পাথরটা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলার পর সুড়ঙ্গে ঢুকলে কেষ্টবাবুর লোকেরা যদি গুলি ছোড়ে, তা হলে আমাদের কারও না-কারও প্রাণের ঝুঁকির প্রশ্ন আছে।

কর্নেল কিছু বলার আগেই হালদারমশাই বলে উঠলেন,—কেষ্টবাবু আর তার দুইজন লোক দীপুরে লইয়া উল্টাদিকে পলাইয়া গেছে।

তপেশবাবু বললেন,—কতক্ষণ আগে?

—আধ ঘণ্টারও বেশি! কী জানি, ঠিক টাইম স্মরণ হয় না!

—তা হলে তো ওরা পুলিশফোর্স যাওয়ার আগেই পালিয়ে গেছে!

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—এক কাজ করা যাক। পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজায় আটকে দিয়ে পুলিশফোর্স আশেপাশে ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। গড়ের

এই জঙ্গলে কেষ্টবাবুর লোকেরা কিছুক্ষণ আগেও ছিল। এখন আপনাদের দেখে পালিয়ে যেতেও পারে। আবার পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারে। আপনি একজন অফিসারকে সেই মতো নির্দেশ দিন। কেষ্টবাবুর লোকেদের সামনে পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি নেবেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী? চলুন, আমরা জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্বদরজার কাছে যাই। কী ঘটেছে, এখনই জানা দরকার।

তপেশবাবু একজন অফিসারকে ডেকে সেইমতো নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন,—কর্নেলসায়েব! ওখানে আমাদের একজন অফিসারের কাছে কর্ডলেস টেলিফোন আছে। এখনও কোনও সাড়া পাচ্ছি না। তার মানে, হয় কেষ্টবাবুরা আগেই কেটে পড়েছে, নয় তো পুলিশের জিপের শব্দ শুনে সুড়ঙ্গে লুকিয়েছে। আমি ফোন করে দেখি বরং।

তপেশবাবুর হাতে কর্ডলেস টেলিফোন ছিল। ডায়াল করে একটা সাংকেতিক নম্বর বললেন। তারপর কানের কাছে ফোনটা ধরে কিছু শোনার পর বললেন,—ওকে! ওকে! আমরা যাচ্ছি!

ফোন নামিয়ে তিনি বললেন,—এস আই মিঃ মিত্র বললেন, সুড়ঙ্গের দরজার ওপর ঘন ঝোপ আর লতাপাতা আছে। তার ফাঁকে তিনি একটা মুখ দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে দেখামাত্র মুখটা অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—তার মানে, ওরা এখনও বেরোতে পারেনি। শিগগির চলুন তপেশবাবু! সুড়ঙ্গে গুলির লড়াই করার বিপদ আছে। ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

আমরা গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে পুলিশভ্যানের কাছে পৌঁছুলুম। তপেশবাবু পুলিশভ্যানের ড্রাইভার এবং দুজন সশস্ত্র গার্ডকে ওখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কর্নেল আস্তে বললেন,—আমাদের আর একটু ডানদিকে গিয়ে নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

এই সময় তপেশবাবুর টেলিফোনে বিপ বিপ শব্দ হল। তিনি কর্ডলেস ফোনটা কানের কাছে ধরে সাড়া দিলেন। তারপর কর্নেলকে চাপাস্বরে বললেন, —সাংঘাতিক লোক কেষ্টবাবু! দীপুর কানের কাছে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছে। তার দুই সঙ্গী তার পিছনে আছে। কেষ্টবাবু বলছে, তাদের যেতে না দিলে দীপুর মাথায় গুলি করবে। তারপর পুলিশ তাদের গুলি করে মারুক। তাতে পরোয়া নেই।

কর্নেল দিনশেষের ম্লান আলোয় বাইনোকুলারে জঙ্গল দেখে নিয়ে

বললেন,—চিনতে পেরেছি। ওই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে উঠতে হবে। শীতের সময়। তাই ঝরাপাতায় পায়ের শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভিতর ঝরাপাতার উপদ্রব নেই।

কর্নেলের পিছনে সুরেন, তপেশবাবুর পিছনে আমি এবং আমাদের ডান পাশে হালদারমশাই—এইভাবে গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বন্য প্রাণীদের মতো আমরা ঢাল বেয়ে উঠে গেলুম। কর্নেল, তপেশবাবু, হালদারমশাই আর আমার হাতে উদ্যত গুলিভরা রিভলভার। এইসময় জঙ্গলে শীতের হাওয়া বইছিল। এতে আমাদের সুবিধেই হল। একখানে কর্নেল থেমে গেলেন। আমরাও থেমে গেলুম। তারপর সত্যিই এক সাংঘাতিক দৃশ্য চোখে পড়ল।

সুড়ঙ্গের দরজার বাইরে কেষ্ট অধিকারী সুরেনের বয়সী একটি ছেলের কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে এক পা-এক পা করে সামনে এগোচ্ছে। তার দুপাশে দুটো ষণ্ডামার্কা লোকের হাতে বিদেশি রাইফেল বলেই মনে হল। তারা পুলিশের দিকে সেই রাইফেল তাক করে এগোচ্ছে। দুজন পুলিশ অফিসার রিভলভার এবং কনস্টেবলরা রাইফেল উঁচিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষ শুরু হবে, এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপর কেষ্টবাবু চাপা গলায় গর্জে উঠল,—আমরা মরব। তার আগে কুমুদমাস্টারের ছেলে মরবে। এখনও ভেবে দেখ পুলিশবাবুরা! ভালয়-ভালয় আমাদের যেতে দাও! দেখছ তো? আমার দুই সঙ্গীর হাতে অটোমেটিক কালাশ্নিকভ রাইফেল। প্রতি সেকেন্ডে দুটো করে গুলি বেরোয়। তোমরা গুঁড়ো হয়ে যাবে।

হঠাৎ অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। হালদারমশাই কখন এগিয়ে গেছেন গুঁড়ি মেরে, তা লক্ষ্য করিনি। তিনি আচম্বিতে ঝাঁপ দিলেন কেষ্ট অধিকারীর উপরে। কেষ্টবাবু তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল। এদিকে কর্নেল ও তপেশবাবুও কেষ্টবাবুর দুই সঙ্গীর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের কালাশ্নিকভ্ রাইফেল দুটো দুজন পুলিশ অফিসার দ্রুত এসে জুতোর তলে চেপে ধরলেন। দুজনে ধরাশায়ী হল। এবং কেষ্টবাবুর মতোই তাদের পিঠেও সশস্ত্র এবং ওজনদার দুজন মানুষ কর্নেল এবং ও.সি তপেশ সান্যাল। কেষ্টবাবুর রিভলভার ছিটকে পড়েছিল। হালদারমশাই তার রিভলভারটা দেখিয়ে দীপুর উদ্দেশে বললেন,— এই পোলাটা কী করে! খাড়াইয়া আছ ক্যান? কেষ্টবাবুর ফায়ার আর্মস কুড়াইয়া লও!

দীপু তবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সুরেন লাফিয়ে এসে কেষ্টবাবুর রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ফিক করে হেসে দীপুকে বললো,—হ্যাঁ

রে! তুই তো গিয়েছিলি হাফপ্যান্ট স্পোর্টিং গেঞ্জি পরে। ফিরলি সোয়েটার আর ফুলপ্যান্ট পরে। কে কিনে দিল?

দীপু এবার আড়ষ্টভাবে হেসে বলল,—চট্টরাজসায়েব!

ততক্ষণে ধরাশায়ী কেষ্ট অধিকারী এবং তার দুই সঙ্গীকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়েছে। তপেশবাবু বললেন,—মিত্রবাবু! সাবধানে আসামিদের নিয়ে যান। আমি গড়ের জঙ্গল থেকে পুলিশফোর্সকে কলব্যাক করি। আমি নিচে গিয়ে ভ্যানে ফিরব। কর্নেলসায়েব—

কর্নেল দ্রুত বললেন,—আমি কফি খেতে বাংলোয় ফিরব। দীপুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সুরেন, ওর বাবাকে তুমি গিয়ে খবর দাও। চলো দীপু!

তপেশবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি এবং দীপু, দুজনকেই আমাদের দরকার হবে।

—জানি। আজ রাতেই আমাদের সবাইকে আপনি কেষ্ট অধিকারী অ্যান্ড কম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পেয়ে যাবেন। অবসরপ্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক ডঃ দেবব্রত চট্টরাজকে বরং রাজসাক্ষী করার ব্যবস্থা আমি কলকাতায় ফিরেই করব। চলি!

বাংলোয় ফেরার পর চৌকিদার নাখুলাল দীপুকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—দীপুবাবু! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? সুরেন তোমার জন্য কেঁদেকেটে অস্থির! সুরেন কই?

কর্নেল বললেন,—সুরেন দীপুর বাবাকে খবর দিতে গেছে। নাখুলাল! শিগগির কফি চাই! আর আমাদের হালদারমশাইয়ের জন্য এক বালতি গরম জলও চাই। উনি গেরুয়া ধুলো মেখে খাঁটি সায়েব হয়ে গেছেন।

হালদারমশাই বললেন,—খুব ধস্তাধস্তি বাধছিল। এরা চারজন। আমি একা।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে খেতে কর্নেল বললেন,—তুমি কফি খাচ্ছ না কেন দীপু? কফি খেলে নার্ভ চাঙ্গা হবে। কফি খাও। আজ খেয়েছ?

দীপু বললো,—দুপুরে সুড়ঙ্গের মধ্যে খাবার এনেছিলেন কেষ্টবাবু। আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে হয়নি। শুধু উপেনদা আমাকে বস্তির একটা ঘরে গোবিন্দের কাছে আটকে রেখেছিল। সে আমাকে ড্যাগার দেখিয়ে হুমকি দিত। বাইরে থেকে তালা এঁটে রাখত।

—তুমি সেখান থেকে পালিয়েছিলে কী করে?

—এক রাত্রে গোবিন্দ মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় সেই ঘরে শুতে ঢুকেছিল। ভেতর থেকেও রোজ রাত্রে তালা এঁটে দিত। সে রাত্রে সে তালা আঁটতে ভুলে গিয়েছিল। খুব নেশা হয়েছিল তার। সেই সুযোগে আমি পালিয়ে

গিয়েছিলুম। ডঃ চট্টরাজের নেমকার্ডে ঠিকানা আমার মুখস্থ ছিল। খুঁজে খুঁজে তাঁর বাড়ি গেলুম। তাঁকে বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা দিলুম। কিন্তু উনি আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। বলতেন, উপেন দত্তের লোকেরা তোমাকে খুঁজছে। পরে বুঝেছিলুম, উনিও আমাকে আটকে রেখেছেন।

—হুঁ। বাকিটা আমার জানা। তোমার বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা তোমার একটা বইয়ের ভিতরে পেয়ে গেছি। এই দেখ!

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা পুরনো কাগজ দেখালেন। দীপু বললো,—কিন্তু রত্নকোষ তো পাওয়া যায়নি।

কর্নেল বললেন,—রত্নকোষের কথা থাক। চুপচাপ কফি খাও। তোমার বাবা এলে একসঙ্গে আমরা থানায় যাব। তারপর আজ রাত একটার ট্রেনে কলকাতা ফিরব। তোমার আর কোনও বিপদ হবে না।

একটু পরে কুমুদবাবু এলেন সুরেনের সঙ্গে। তিনি দীপুকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন।



পুলিশের গাড়ি কর্নেল, হালদারমশাই এবং আমাকে সেই রাত্রে রায়গড় স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। কলকাতায় ফেরার পর সেইদিন বিকেলে কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে হাজরা রোডে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

অজয়েন্দুবাবু কর্নেলকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—বলুন কর্নেলসায়েব! আপনার অভিযান সফল হয়েছে তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—অভিযান সফল! কিন্তু একটা কথা। আপনি কি জানতেন কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নানা অঞ্চলে জঙ্গিদের কাছে চোরা বিদেশি অস্ত্র পাচারের কারবার করত?

অজয়েন্দুবাবু আঁতকে উঠে বললেন,—কী সর্বনেশে কথা! ঘূণাক্ষরে টের পাইনি তো!

—যাই হোক, কেষ্টবাবু সদলবলে ধরা পড়েছে। আপনাকে পরে বিস্তারিত বলব। আপাতত একটা গোপন কাজকর্ম করতে চাই। আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন। বাইরে যেন কেউ না থাকে।

কুমারবাহাদুর বেরিয়ে গিয়ে সেইমতো ব্যবস্থা করে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল। তিনি চাপাস্বরে বললেন,—সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করতে পেরেছেন কি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে প্রথমে খবরের কাগজের প্যাকেটে ভরা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা তাঁকে দিলেন। তারপর বললেন,—এবার আপনাকে যে

জিনিসটা দেব, সেটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ সেই জিনিসটা মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

বলে তিনি কিটব্যাগ থেকে প্যাকেটে ভরা একটা জিনিস বের করলেন। দেখামাত্র চিনতে পারলুম, এটা হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্তের মৃতদেহের কাছে নগ্ন মাটি খুঁড়ে সুরেন বের করেছিল। কর্নেল মেটাল ডিটেক্টরে এটারই খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে খুলে বলেননি। আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে থেকেছেন।

প্যাকেটের ভিতর থেকে ছোট্ট চৌকোগড়নের কালো জিনিসটা কর্নেল বের করে বললেন,—এটা একটা রত্নকোষ। এটার কথাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আছে। এবার দেখুন, আমি বত্রিশের ধাঁধার সূত্র অনুসারে এটা খুলছি। তবে ধাঁধার জট ছাড়ানোর কৃতিত্ব আমার নয়, কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের ছেলে দীপুর। এই ছকের উল্লেখ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আভাসে ছিল। এই দেখুন!

কর্নেল পকেট থেকে দীপুর বইয়ের ভিতরে পাওয়া কাগজটা টেবিলে মেলে ধরলেন। বললেন,—এক থেকে পনের পর্যন্ত সংখ্যা 'চতুষ্ক' পদ্ধতিতে এমন সাজাতে হবে, যে কোনও দিকের যোগফল বত্রিশ হয়। দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার জট কী ভাবে খুলেছে, লক্ষ্য করুন।

| | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩২ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | ১ | ৮ | ৯ | ১৪ | ৩২ |
| ৩২ | ১১ | ১২ | ৩ | ৬ | ৩২ |
| ৩২ | ৭ | ২ | ১৫ | ৮ | ৩২ |
| ৩২ | ১৩ | ১০ | ৫ | ৪ | ৩২ |
| | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩২ | |

অজয়েন্দুবাবু রত্নকোষটি দেখে বললেন,—প্রায় তিনশো-চারশো বছরের এই জিনিসটা এখনও পরিষ্কার আছে দেখছি!

কর্নেল বললেন,—পরিষ্কার ছিল না। আমি ব্রাশের সাহায্যে লোশন দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করেছি। এবার এই আতস কাঁচের সাহায্যে নাগরী অক্ষরে লেখা সংখ্যাগুলো দীপুর ছক অনুসারে টিপে যাচ্ছি। চারদিক থেকে সংখ্যাগুলো চারবার টিপলে রত্নকোষটা খুলে যাবে।

কর্নেল সাবধানে তর্জনীর চাপে রত্নকোষের পর পর লেখা ১ থেকে ১৫টি সংখ্যা একে একে ছক অনুসারে চারদিকে থেকে চারবার পর-পর টিপলেন। অমনই রত্নকোষটা খুলে দুভাগ হয়ে গেল। আমরা দেখলুম, ভিতরে রঙবেরঙের একটি রত্নমালা ঝলমল করে উঠল। কর্নেল মালাটি তুলে বললেন,—হীরা-চুনি পান্না মুক্তা সাজানো ঐতিহাসিক মালা। এখন এর দাম হয়তো বহু লক্ষ টাকা। এই মালা মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ আপনার পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন। অতএব আইনত এটা আপনারই প্রাপ্য।

বলে তিনি রত্নমালাটি কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। হালদারমশাই সহাস্যে বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! এমন একখান হিস্টোরিক্যাল জুয়েলের জন্য যুদ্ধ বাধবে না ক্যান?

অজয়েন্দুবাবু রত্নমালা গলা থেকে খুলে কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—আবার আগের মতো রত্নকোষে এটা ভরে দিন। আমি আয়রনচেস্টে লুকিয়ে রাখব। তারপর আপনাকে ডেকে আবার এটা বের করে বিক্রি করব। সেই টাকায় একটা অনাথ আশ্রম খুলব।

কর্নেল মালাটা আগের মতো রত্নকোষে সাজিয়ে দুটো ঢাকনা টিপে ধরলেন। রত্নকোষ আবার বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল টানাটানি করে দেখে বললেন,—আবার বত্রিশের ধাঁধার জট না ছাড়াতে পারলে এটা খুলবে না। কাজেই দীপুর এই কাগজটা রেখে দিন। আর একটা কথা, কুমুদবাবু গরিব মানুষ। দীপুর পড়াশুনার জন্য—

তাঁর কথার উপর অজয়েন্দুবাবু বলে উঠলেন,—দীপুর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব আমার। কুমুদকে আজই লিখে পাঠাচ্ছি। এবার এটা আমি আয়রনচেস্টে রেখে আসি। তারপর কফি খেতে খেতে আপনার কাছে সব কথা শুনব।

উনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলে হালদারমশাই বললেন,—কথাটা বলি নাই। এবার বলি। কেষ্টবাবুর পিঠে চাপছিলাম। তখনই ট্যার পাইছিলাম, অর পিঠে একখান আব আছে। কুঁজও কইতে পারেন। কুঁজে হেভি প্রেসার দিচ্ছিলাম।

কর্নেল কথাটা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।